Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

খোঁজ

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

খোঁজ

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

মদীনা পাবলিকেশান্স

www.boighar.com

৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

খোঁজ

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১১৯২৩৫
www.boighar.com

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী- ২০১৫ ইরেজী
রবিউল আউয়াল- ১৪৩৬ হিজরী
পৌষ ১৪২১ বাংলা

কম্পোজ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/-২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.boighar.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.boighar.com
মূল্য ঃ ১০০/- টাকা মাত্র।
ISBN-978-9894-675-26-6

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

আমার কনিষ্ট পুত্র এস.এম. শামশুল ইসলাম, জুয়েলকে

– শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

খোঁজ

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

১

"আমাদের পয়সার বিদ্যো বেচে খাবে তো হারামখাবে।"

– হুঁঃ-হুঁঃ-হুঁঃ। নো ফাদার, নো মাদার,আমি আমার পয়সায় হালাল খানা খাচ্ছি!

www.boighar.com

বিড়বিড় করে কথা বলছে মটর মেকানিক্স্ প্রিন্স্। জামালউদ্দীন প্রিন্স। বাপ-মায়ে সখ করে এ অতিরিক্ত প্রিন্স্ নামটা দিয়েছেন। চেহারাটা অবশ্য প্রিন্সের, অর্থাৎ রাজপুত্রের মতোই। কে একজন খেদ্ করে বলেছিলো– "বাপ-মায়ে নাম রাখলো দৌলতজাহান ধনী। হায়রে কপাল! ধনী খাচ্ছে ধান কুড়িয়ে"। কথাটা এই রকমই আর কি! বাপ-মায়ে নাম রেখেছে প্রিন্স। সেই প্রিন্স এখন মটর ম্যাকানিক্স্। অর্থাৎ রাজপুত্র খায় মটর ম্যাকানিক্সের কাজ করে। আরো উল্লেখযোগ্য যে, প্রিন্সের চেহারাটাই শুধু দর্শনীয় নয়, তার আচরণও আকর্ষণীয়। সে ঈমানদার আর নামাজী লোক। www.boighar.com

মটর গাড়ি হাঁকিয়ে গ্যারেজে এসে ঢুকলেন মিঃ সলীমুল্লাহ নামের এক অতি আধুনিক ভদ্রলোক। গাড়ি থেকে নামতে নামতে তিনি ভারিক্কি চালে বললেন– এই জাম্লা, আমার ইঞ্জিনটা ডিস্টার্ব দিচ্ছে। দ্যাখোতো কি হয়েছে?

ক্ষেপে গেলো জামালউদ্দীন প্রিন্সের সহকারী হাতেম আলী। সে প্রতিবাদ করে বললো– জাম্লা-জাম্লা করছেন কেন? উনার কি ভালো নাম নেই?

আগন্তুক সলীমুল্লাহ সাহেব তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন– ভালো নাম? কি ওর ভালো নাম?

হাতেম আলী বললো– প্রিন্স। উনার ভালো নাম জামালউদ্দীন প্রিন্স।

হো-হো করে হেসে উঠলেন মিঃ সলীমুল্লাহ। বললেন– প্রিন্স্? সাব্বাস।

ঃ মানে?

ঃ মানে গ্যারেজের কামলার নাম প্রিন্স্? দিনে দিনে কত আর শুনবো!

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ হয়নি কিছু। চোখে মুখে কাদা কালী মেখে সেজেছে বড় প্রিন্স্ তোমাদের।

ঃ কেন পছন্দ হয় না? লেবাস সর্বস্ব আধুনিক ভদ্দর লোকের মতো বাদুরচোষা চেহারা নাকি এই ভাইজানের?

মিঃ সলীমুল্লাহ গরম কণ্ঠে বললো– তার মানে? কাকে উদ্দেশ্য করে বলছো কথাটা।

হাতেম আলী বললো– যাদের চেহারা বাদুরচোষা-বাদুরচাটা, তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি। আমার ভাইজানের চেহারা কি তাদের মতো বাদুরচোষা।

বলা বাহুল্য, মিঃ সলীমুল্লাহর চেহারাটা ঐ রকমই। কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে মিঃ সলীমুল্লাহ বললেন– আরে রাখ ব্যাটা, আমি চেহারা দেখতে আসিনি। আমার ইঞ্জিনটা গড়বড় করছে, এসে ওটা ঠিক করে দিক।

জবাবে হাতেম আলী বললো–তাহলে ডাক্তারের কাছে যান সাহেব। উনি মানুষের ইঞ্জিন ঠিক করতে পারেন না।

ঃ হুঁশিয়ার বেয়াদব! মানুষের ইঞ্জিন হবে কেন? আমার গাড়ির ইঞ্জিন গড়বড় করছে সেটা ঠিক করে দিক।

ঃ তাহলে সেই কথা বলুন। উল্টাপাল্টা বলেন কেন?

ঃ তবেরে ব্যাটা, আমার কথার ভুল ধরো–

তেড়ে এলেন সলীমুল্লাহ সাহেব। জামালউদ্দীন প্রিন্স্ গ্যারেজে রাখা গাড়িটার ইঞ্জিন ধোয়ামোছা করছিলো। এবার সে এগিয়ে এসে বললো– আরে থামুন– থামুন। কি হয়েছে আমাকে বলুন। খামাখা ঐ ছেলেমানুষের সাথে কেন লেগেছেন?

ঃ ছেলেমানুষ। নাকের নীচে দেড় হাত গোঁফ যার, সে ছেলেমানুষ?

ঃ আরে সাহেব, সবে দেখা দিয়েছে গোঁফের রেখা। আপনি দেড়হাত গোঁফ দেখলেন কোথায়?

ঃ আচ্ছা বেশ-বেশ। ও ছেলেমানুষ – দুধের বাল্লকা। ওর কথা থাক। তুমি দেখো, আমার গাড়ির ইঞ্জিনটা ট্রাব্‌ল্ দিচ্ছে কেন?

জামালউদ্দীন প্রিন্স ঐ গাড়ির কাছে গেলো এবং ইঞ্জিনের ঢাক্‌না খুলে দুইতিন মিনিট টিপেটেপে দেখলো। এরপর মিঃ সলীমুল্লাহর কাছে এসে বললো– যান সাহেব, ঠিক হয়ে গেছে।

মিঃ সলীমুল্লাহ নাখোশ কণ্ঠে বললেন– তামাসা করছো আমার সাথে?

ঃ তামাসা!

ঃ নয়তো কি? দুই মিনিটেই ইঞ্জিনের সমস্যা দূর হয়ে গেলো।

ঃ হ্যাঁ, তাই গেলো। সমস্যাটা তো আদৌ কোনো জটিল সমস্যা নয়। কানেক্‌শানের একটা তার ঝুলে গিয়েছিলো, ওটা টেনে দিয়েছি।

ঃ বলো কি হে? এত সিম্‌প্‌ল্ ঘটনা? আমি ভাবলাম–

ঃ মোটেই জটিল কিছু নয়। ইঞ্জিন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকলে, আপনিও ধরতে পারতেন ওটা।

মিঃ সলীমুল্লাহ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন– হোয়াট? ইঞ্জিন সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই?

জামালউদ্দীন প্রিন্স নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো– তাইতো মনে হচ্ছে।

ঃ তবে রে! এত বড় কথা?

ঃ কথা আমার বড় ছোট যাই হোক, গাড়ি চালাতে হলে একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার রাখবেন। সব সময় নিজে চালাবেন না। তেপান্তরে ঠেকে গেলে বিপদ হবে।

এই সময় হাতেম আলী ডেকে বললো– ভাইজান, তাড়াতাড়ি আসুন। এদিকে এই গাড়ির মালিক গাড়ি নিতে এসে গেছেন।

প্রিন্স বললো– ও আচ্ছা, আসছি–

এরপর সলীমুল্লাহকে বললো– আপনি এবার যান। যা বললাম, মনে ধরলে সেটা করবেন। আপনার সাথে কথা বলার আর আমার সময় নেই–

বলেই সেখান থেকে সরে এলো জামালউদ্দীন প্রিন্স।

জামালউদ্দীন প্রিন্স্ ও হাতেম আলী একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে। বাড়িটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম বাড়ি। দুইজন ভোর বেলা উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে। তারপর ছানা সেদ্ধ করে গরম ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে ওয়ার্কশপের কাছে। দুপুরে হোটেলে খায় আর বিকেল চারটেয় ওয়ার্কশপের চাবি মালিকের হাতে দিয়ে ফিরে আসে বাসায় ব্যস্ তার পর ড্যাম্ অবসর। সাবান মেখে গোছল করে এসে আরাম করে বসে পড়ে রাতের খাবারের আন্‌যাম করতে।

শুক্রবার ছুটির দিন। সেদিন তারা ভালোমন্দ পাক শাক করে খায় আর সন্ধ্যার আগে বাইরে বেরোয় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে।

হাতেম আলী পাকশাকে ওস্তাদ। একাজে খুব আনন্দও পায় সে পাকশাকের কাজে ব্যস্ত আছে হাতেম আলী। জামালউদ্দীন প্রিন্স বসে বসে তাল ঠুক্‌ছে টেবিলে। তাল ঠুকতে ঠুকতে যাত্রা শিল্পীর স্টাইলে হঠাৎ সে সশব্দে বলে উঠলো–

www.boighar.com

"চলরে আনন্দ, মহানন্দে ছুটে চল্,
খুঁজে নিবি তোর চিরানন্দময়ে – "।

কথাটা কানে যেতেই হাতেম আলী উদ্গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– কি বললেন ভাইজান, কি বললেন?

জামালউদ্দীন বললো– এটা যাত্রাপালার ডায়্যালগ্।

হাতেম আলী বললো– যাত্রাপালার ডায়্যালগ?

ঃ হ্যা, একটা যাত্রাপালার।

ঃ কেমন কেমন?

ঃ রাখা ক্ষেপে গিয়ে আনন্দময় নামের তাঁর তরুণ সেনাপতিকে চাকরী থেকে বহিস্কার করে দিলেন। এতে ঐ তরুণ দুঃখিত না হয়ে যাওয়ার সময় খোশকণ্ঠে বললো– "চল্‌রে আনন্দ, মহানন্দে ছুটে চল্, খুঁজে নিবি তোর চিরানন্দময়ে"।

ঃ তাই? তা কথাটা আপনার বুঝি খুব ভালো লেগেছিলো?

ঃ শুধু ভালোই লাগেনি, বাড়ি থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর আমিও অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছি– "চল্‌রে প্রিন্স্, মহানন্দে ছুটে চল্, খুঁজে নিবি তোর চিরানন্দ ময়ে"।

ঃ তার মানে - তার মানে? আপনাকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে?

ঃ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে।

ঃ কি গজব - কি গজব! কে দিলো ঘাড় ধাক্কা?

ঃ আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা হুজুর। আম্মা হুজুরাইনও তাঁর সাথে ছিলেন।

ঃ কি তাজ্জব! তাতে আপনার দুঃখ হয়নি?

ঃ এক বিন্দুও নয়। বরং কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব যেমন ব্যোম্ কেদারনাথ বলে ঢুকে পড়েছিলেন পল্টনে, আমিও ব্যোম্ কেদারনাথ বলে নেমে পড়লাম পথে আর পরমানন্দে বলে উঠলাম– "চল্‌রে প্রিন্স্, মহানন্দে ছুটে চল্, খুঁজে নিবি তোর চিরানন্দময়ে"।

ঃ মা'শা আল্লাহ! আপনি কি তাহলে ঐ চিরানন্দময়কে খুঁজে নেয়ার জন্যেই পথে এসে নেমেছেন?

ঃ তবে কি ঘাস কাটার জন্যে এই পথে পথে ঘুরছি? এখানে এসে পড়ে আছি কি আচ্ছু ভুয়ার বাচ্চা দেখার আশায়?

হাতেম আলী ফের উৎসাহিত হয়ে উঠলো বললো– সোবহান আল্লাহ! ঘটনা কি বলুন তো ভাইজান। আপনার অতীতটা তো আমি কিছুই জানিনে, ব্যাপারটা খুলে বলুন তো, শুনি।

ঃ তাহলে আজ অনশনব্রত পালন করতে হবে। হাংগার স্টাইক করতে হবে, বুঝেছো?

ঃ মানে?

ঃ চুলোয় পানি ঢেলে দিয়ে এসে বসতে হবে কাহিনী শুনতে।

ঃ ভাইজান!

ঃ এটা কি দু'দশ মিনিটের কাহিনী? ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাবে এ কাহিনী বলতে গেলে।

ঃ তাই?

ঃ জি হাঁ। আজ নিজ কাজে মন দাও। অন্য একদিন অবসর মতো বসে সব কথা শুনাবো।

ঃ বলেছেন?

ঃ জি, বলছি।

অগত্যা হাতেম আলী আবার পাক শাকে মন দিলো।

প্রতিদিন দুপুরে কাজ বন্ধ করে আগে তারা দুইজন হাতমুখ ধুয়ে নামাজ আদায় করে এবং তারপর হোটেলে দুপুরে খাবার খেতে যায়। প্রিন্সের দেখাদেখি হাতেম আলীও পুরোপুরি নামাজী হয়ে গেছে। সেদিন নামাজ আদায় করে হোটেলে যাওয়ার জন্যে উঠতে হাতেম আলী একটু টিলিমিলি করছিলো। প্রিন্স তাকে তাকিদ দিয়ে বললো– এই, উঠো–উঠো, কুইক্। এমনিতেই আজ একটু লেট হয়ে গেছে। খেতে যেতে আরো লেট করলে। কাজে যেতে সার্টেনলী আজ জিয়াদা লেট হয়ে যাবে। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ এমন আইডেল্নেস আমাদের মানায় না। ইট্ লুক্স্ অড।

একটুও না নড়ে হাতেম আলী বললো– দাঁড়ান–দাঁড়ান, একদিন লেট হলে কিছু এসে যাবে না। আগে একটা কথার জবাব দিন তো? আপনার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে আপনি ঢের লেখাপড়া জানেন। আপনি কেন ওয়ার্কশপে ধুলার মধ্যে পড়ে থেকে হাতুরী-শাবল পিটছেন? ভালো দেখে একটা চাকুরী নিলে তো চেয়ারে বসে দিন কেটে যায় আপনার।

জামালউদ্দীন প্রিন্স বললো– কি বললে? চাকুরী নেবো?

ঃ হ্যাঁ, নেবেন। আপনার যা লেখাপড়া–

ঃ আরে দূর দূর লেখাপড়া দেখলে কোথায়?

ঃ দেখলাম কোথায় মানে? করেননি আপনি লেখাপড়া? কোনো–

– বিদ্যা নেই আপনার পেটে– এটা বলতে চান?

থমকে গেলো প্রিন্স। "আমাদের পয়সার বিদ্যা বেচে খাবে তো হারাম খাবে"– বাপ-মায়ের এই কথাটা তড়াক্ কথার জবাব দিতে তার একটু দেরী হলো। হাতেম আলী ফের বললো– কি হলো ভাইজান? করেননি আপনি লেখাপড়া!

জবাবে এবার প্রিন্স বললো– হ্যাঁ, এককালে কিছুটা করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়ে আমার তামাম বিদ্যা গুলিয়ে গেছে। এই ফুট্ফাট্ দুই চারটে ইংরেজী শব্দই মনে আছে শুধু। জাহাজ ঘাটে খালাসীরাও অমন ইংরেজী বলে থাকে।

ঃ বলেন কি! ঠিক বলছেন?

জামালউদ্দীন ফের তাকিদ দিয়ে বললো– ঠিক-বেঠিক এত জেরা করার দরকারস নেই। আমি বলছি, ব্যস্ ফুরিয়ে গেলো। উঠো– উঠো। হোটেলে যাবে চলো–

– বলেই রওনা হলো জামালউদ্দীন প্রিন্স। অগত্যা হাতেম আলীও ক্ষুন্নমনে হাঁটতে লাগলো তার পিছে পিছে।

অন্য এক ছুটির দিনে অনেক বেলা থাকতে, অর্থাৎ সাঁঝের অনেক খানি আগে, বেড়াতে বেরোলো জামালউদ্দীন প্রিন্স্ ও হাতেম আলী। হাতেম আলী

এই এলাকার লোক। এখানকার পথঘাট, দোকান পাট ও দর্শনীয় স্থান বস্তু সবই হাতেম আলীর চেনা। তাই হাতেম আলী আগে আগে হাঁটছে আর প্রিন্সকে এটা ওটা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এক জায়গায় প্রসাধনী দ্রব্যের এক ফেরিওয়ালাকে ঘিরে ভিড় করছিলো কয়েকজন মেয়ে। তাদের পাশ দিয়ে যেতেই বোরকাপরা এক মেয়ে ডাক দিলো– কে ওটা। আলী নয়? মানে, হাতেম আলী নয়?

মেয়েটার মুখের ঢাকনা মাথার উপর তোলা ছিলো। এবং মুখ মন্ডল সম্পূর্ণ খোলা ছিলো। দেখেই বোঝা গেলো, মেয়েটা তরুণী ও অপূর্ব সুন্দরী। এতই সুন্দরী যে, ভিড় করা সকল মেয়ের, অর্থাৎ তরুণীর মাঝে একাই সে জ্বলছিলো। মেয়েটার ডাকে সেদিকে চেয়েই হাতেম আলী সোল্লাসে বলে উঠলো– আরে কে? আলো ম্যাডাম নাকি? তাইতো, ম্যাডামই তো! আমাকে ডাকছেন ম্যাডাম?

মেয়েটা, মানে আলো ম্যাডাম বললো– হ্যাঁ। একটু এদিকে এসোতো? বলতে বলতে মেয়েটাও ভিড় থেকে সামনে এগিয়ে এলো হাতেম আলী তার সামনে গিয়ে বললো– জি ম্যাডাম, বলুন।

জামালউদ্দীন প্রিন্স অনেক খানি পেছনে থাকায় আলো ম্যাডামের নজরে সে পড়লো না। তাই আলো ম্যাডাম– স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো– বেড়াতে বেরিয়েছো?–

হাতেম আলী বললো– জি ম্যাডাম। আজ ছুটির দিন। ওয়ার্কশপের কাজ নেই। তাই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ঃ ভালো– ভালো। তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হলো। আমার একটা কাজ করে দেবে?

ঃ জি, বলুন?

ঃ ড্রাইভার বদলাতে বদলাতে আমি যে পেরেশান হয়ে গেলাম। পাঁচ পাঁচটা ড্রাইভার বদলালাম, তবু একটা ভালো ড্রাইভার পেলাম না।

ঃ ম্যাডাম!

ঃ যাকেই নিলাম, সেই ব্যাটাই চোর, প্রতারক আর ঘোরতর মিথ্যাবাদী। গাড়ির তেল, পার্টস্ চুরি করা ছাড়াও সত্য কথা তাদের কারো কাছ থেকে পেলাম না। আসলে ঈমান বলতে তাদের কারো কাছ থেকে পেলাম না। আসলে ঈমান বলতে তাদের মধ্যে এক ফোঁটাও না থাকায়, এই অবস্থা হয়েছে। ঈমানদার আর নামাজী লোক পাওয়া গেলে এমনটি হতো না।

ঃ ড্রাইভারেরা সাধারণতঃ এই রকমই হয় ম্যাডাম। হারামী পয়সা উপায় করে আর শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে। ঈমানদার লোক পাবেন কোথায়?

ঃ তুমি একটা ভালো ড্রাইভার খুঁজে দাও না? ঈমানদার আর নামাজ-রোজা করা লোক?

ঃ আমি তাদের পাবো কোথায় ম্যাডাম? কোত্থেকে খুঁজে দেবো?

ঃ কেন? তুমি ওয়ার্কশপে কাজ করো। অধিক ক্ষেত্রে ড্রাইভারেরাই তো তোমাদের কছে গাড়ি সারাতে আসে।

ঃ তা আসে বটে। তবে যা বললাম, সব ঐ রকম। গাঁজিল আর মদারু। নামাজী আর ঈমানদার লোক–

এই সময় কয়েকজন তরুণী এগিয়ে এসে আলো ম্যাডামকে বললো– কি রে আলো, কিছুই যে নিলিনে বড়?

www.boighar.com

আলো ম্যাডাম বললো– না, কিছুই পছন্দ হলো না আমার।

তরুণীদের মধ্যে একজন সামনে তাকিয়ে হঠাৎ চাপাকণ্ঠে বলে উঠলো– ওমা। কি চেহারা গো! একদম রাজপুত্র! তরুণীটির দৃষ্টি অনুসরণ করে অদূরে দণ্ডায়মান জামালউদ্দীন প্রিন্সকে দেখে অন্যান্য সবাই চাপাকণ্ঠে বলে উঠলো– তাইতো রে! ঠিকইতো! লোকটার চেহারা বিলকুল রাজপুত্রের মতোই তো!

বোরকার ঢাকনা নামিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকলো আলো ম্যাডাম। এরপর হাতেম আলীকে বললো– কে ঐ লোক? তোমার সাথেই এসেছে নাকি?

হাতেম আলী খোশকণ্ঠে বললো– ডি ম্যাডাম, জি-জি। উনি আমার উস্তাদ। উনার সাথেই আমি ওয়ার্কশপে কাজ করি।

আলো ম্যাডাম– উনার সাথেই কাজ করো? তা চেহারাটা তো চিত্তহারী চেহারা। উনার স্বভাব-চরিত্র কেমন?

হাতেম আলী কলকণ্ঠে বলে উঠলো– স্বভাব-চরিত্র? ওরে বাপ্‌রে বাপ্! একেবারেই অতুলনীয়। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই ম্যাডাম। একচুল এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই।

ঃ মানে?

ঃ মানে, এমন চরিত্রবান লোক লাখে একটা পাওয়া যায় না। যেমনই ঈমানদার, তেমনই নামাজ রোজায় কঠিন মনোযোগী। সততায় আর সত্যবাদিতায় উনার জুটি নেই।

ঃ তাই নাকি? নাম কি উনার?

ঃ জামালউদ্দীন, প্রিন্স্। নামে আর চেহারায় খাপে খাপ মিল। উনাকে যিনিই দেখেন তিনিই উনাকে রাজপুত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না।

ঃ তাই?

ঃ জি। সেই সাথে আরো একটা কথা যে, কোনো মেয়ে ছেলের মুখের দিকে ভুলেও তাকান না উনি। এই যে এক সাথে বেড়াচ্ছি, সুন্দরী মেয়েদের দিকে আমি কত তাকালাম, কিন্তু ঐ ভাইজানকে একবারও কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে দেখলাম না।

ঃ বলো কি! এমন লোকও ওয়ার্কশপে কাজ করে?

ঃ সবই নসীব ম্যাডাম। লেখাপড়া তো তেমন কিছু জানেন না। যা কিছু জানতেন, তাও ভাগ্য বিপর্যয়ের সথে গুলিয়ে গেছে। এখন খেটে খাওয়া ছাড়া আর কি করবেন, বলুন?

এক পলক চিন্তা করে আলো ম্যাডাম হাতেম আলীকে বললো– একটু এদিকে এসেতো! একটা কথা বলি–

ইংগিতে হাতেম আলীকে ডেকে নিয়ে কয়েক কদম সরে দাঁড়ালো আলো ম্যাডাম। তা দেখে অন্যান্য মেয়েরা চোখ টেপাটিপি করে বলতে লাগলো– খাইছেরে– এতদিনে বেচারী বোধ হয় ডুবলো।

অন্য একজন বললো– ডুবুক ডুবুক। ওয়ার্কশপের কাম্‌লাকে দেখে যে ডুবে, সে রসতালে যাক। এসো– এসো, আমরা আমাদের কাজে যাই–

তারা সবাই সেখান থেকে চলে গেলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আলো ম্যাডাম হাতেম আলীকে বললো– আচ্ছা, তোমার ঐ উস্তাদ ওয়ার্কশপে কাজ করে যখন, তখন গাড়ি চালাতেও পারেন নিশ্চয়ই?

হাতেম আলী বললো– জি-জি, নিশ্চয়ই পারেন। গাড়ি মেরামত করার পর পরীক্ষা করে দেখার জন্যে উনি যখন গাড়ি চালান, তখন দেখলেই বোঝা যায়, ড্রাইভার হিসাবেও উনি উস্তাদ লোক।

ঃ তাই? তাহলে ওয়ার্কশপে ঐ ঝামেলার মধ্যে পড়ে না থেকে উনাকে আমার গাড়ির ড্রাইভার হতে বলো না? মোটা মাইনে দেবো।

ঃ ম্যাডাম!

ঃ তোমাকেও ভাবতে হবে না। ওয়ার্কশপ থেকে এনে তোমাকেও একটা ভালো কাজে লাগিয়ে দেবো।

ঃ তাহলে তো ভালোই হয় ম্যাডাম। উনারও একটা সদ্‌গতি হয়, আমারও একটা সদ্‌গতি হয়।

ঃ হবে– হবে, যথেষ্ট সদগতি হবে। তোমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সদা সর্বদাই নজর থাকবে আমার।

ঃ ঠিক আছে ম্যাডাম, ঠিক আছে। এখনই তো কথা দিতে পারছিনে, উনাকে আগে প্রস্তাবটা দিয়ে দেখি। উনি রাজী হলে ব্যস্, আর কোনো কথা নেই।

ঃ যে ভাবেই হোক উনাকে তোমার রাজী করাতেই হবে আলী। আমার একান্ত দাবী, এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে।

ঃ জি ম্যাডাম জি। আমার বিশ্বাস, উনাকে রাজী করাতে আমি পারবোই।

ঃ সাব্বাস্। তাহলে আগামী কালই আমি ফলাফলটা চাই। সারাদিন আমি কিন্তু পথ চেয়ে থাকবো তোমার।

ঃ জি আচ্ছা ম্যাডাম, জি আচ্ছা। আপনি এখন যান। আগামী কালই ফলাফল নিয়ে আপনার সাথে দেখা করবো।

ঃ মনে থাকবে তো?

ঃ একশো বার। আজকেই আমি উনাকে রাজী করাবো আর আগামী কালই আমি উনাকে সাথে করে নিয়ে আপনার কাছে আসবো।

ঃ সাব্বাস!

হাতেম আলী জামালউদ্দীন প্রিন্সের কাছে ফিরে এলে প্রিন্স তাকে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার, উনি কে?

হাতে আলী বললো– বিরাট এক ধনী লোকের একমাত্র মেয়ে। যারপর নেই দর্শনধারী মেয়ে।

ঃ হ্যাঁ, দর্শনধারী সেটাতো দেখলাম। নাম কি উনার?

ঃ আলেয়া বেগম আলো। সবাই বলে আলো ম্যাডাম।

ঃ আচ্ছো। তা কি বলেন উনি? মানে আড়ালে ডেকে নিয়ে এতক্ষণ কি বললেন উনি তোমাকে?

উল্লাসে নেচে উঠে হাতেম আলী বললো– বাজী মাত্! আপনার নসীব বোধ হয় এতদিনে সত্যি সত্যি খুলে গেলো ভাইজান।

ঃ আচ্ছা! তা কি ব্যাপার?

ঃ পরে – পরে। আগে বাসায় চলুন, তারপর বলছি সব।

প্রিন্সকে ঠেলে নিয়ে বাসায় ফিরে এলো হাতেম আলী।

বাসায় এসে স্থির হয়ে বসে হাতেম আলী আগে প্রিন্সকে প্রশ্ন করলো– আচ্ছা ভাইজান, মেরামত শেষে গাড়ি পরীক্ষা করে দেখার সময় দেখি আপনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালাচ্ছেন। অনেক সময় গাড়ির স্টিয়ারিং তেমন একটা ধরেও থাকছেন না। ড্রাইভিংয়েও আপনি কি সত্যই এখন উস্তাদ লোক?

জামালউদ্দীন প্রিন্স বললো– কেন, সেকথা কেন?

হাতেম আলী বললো– বলুন না ভাইজান, ড্রাইভার হিসাবেওকি আপনি অদ্বিতীয়?

ঃ দ্বিতীয় তৃতীয় বুঝিনা। গাড়ি চালাতে জানি, এই আর কি। ঃ এই আর কি মানে?

ঃ ফের মানে! গাড়ি চালাতে জানি, ব্যস্! ফুরিয়ে গেলো। এর আবার মানে– অর্থ কী?

হাতেম আলী সশব্দে বলে উঠলো– মার কাটারী! তাহলে আপনাকে ড্রাইভারগিরিই করতে হবে ভাইজান। আর ঐ ওয়ার্ক্‌শপে পড়ে থাকা চলবে না।

জামালউদ্দীন বললো– কি রকম?

ঃ ঐ আলেয়া বেগমের, মানে ঐ আলো ম্যাডামের, আপনাকে যারপর নেই পছন্দ হয়েছে ভাইজান। আপনার চেহারা দেখে আর স্বভাবচরিত্রের কথা আমার কাছে শুনে, আপনাকে ড্রাইভার হিসাবে পাওয়ার জন্যে উনি দিউয়ানা হয়ে গেছেন।

ঃ বলো কি?

www.boighar.com

ঃ যত টাকা মাইনে চান, তাই উনি দেবেন। একজন সৎ ড্রাইভারের উনি বড়ই কাঙাল। যেভাবেই হোক, আপনাকে রাজী করাতে উনি আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ ড্রাইভারের পর ড্রাইভার বদল করেও উনি সৎ আর ঈমানদার ড্রাইভার পাননি। আপনাকে পাওয়ার জন্যে তাই অস্থির হয়ে হয়ে গেছেন উনি। যাকে বলে, একদম ক্ষেপে গেছেন।

ঃ তা তুমি কি বলেছো?

ঃ বলাবলি নেই আমি একদম কথাই দিয়ে এসেছি তাঁকে। আগামিকালই আপনাকে সাথে নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাবো, এ ওয়াদাও করে এসেছি। উনার তর সইছে না।

ঃ বেশ! তবে তো হয়েই গেলো।

ঃ কি হয়ে গেলো?

ঃ আর এক দফা গলাধাক্কা খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঃ ভাইজান!

ঃ অতিমাত্রায় রূপসী তরুণীদের মেজাজ-মর্জিই আলাদা। আজ পছন্দ হলো, কাল পছন্দ না হলে গলা ধাক্কা।

ঃ ভাইজান!

ঃ যে দুর্দান্ত সুন্দরী মেয়ে, তাতে এসব মেয়ের কখন কাকে পছন্দ, তা স্বয়ং বদ্‌রীনাথও জানেন না।

হাসতে লাগলো প্রিন্স। হাতেম আলী চম্‌কে উঠে বললো– তওবা–তওবা! তেমন মেয়েই উনি নন ভাইজান। আপনার মতো মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করতেই পারেন না উনি।

ঃ কেন পারেন না? এসব মেয়েরা তো কখনও ঈমানদার হয় না, নামাজ রোজারও ধার ধারে না। এরা সব পারে।

ঃ গজব হবে ভাইজান। এমন কথা বললে গজব নেমে আসবে।

ঃ কেন?

ঃ উনি যেমনি পরহেজগার তেমনই ঈমানদার মেয়ে। এক ওয়াক্ত নামাজ আর একটা রোজাও বাদ দেন না উনি।

ঃ বলছো?
ঃ জি ভাইজান, হলপ করে বলছি।
ঃ তব্ ঠিক হ্যায়!
ঃ জি?
ঃ কবুল। উনার প্রস্তাব আমি কবুল করলাম।
ঃ আলহামদুলিল্লাহ – আলহামদুলিল্লাহ!

পরেরদিনই হাতেম আলীর সাথে জামালউদ্দীন প্রিন্স আলেয়া বেগম আলোর বাসায় রওনা হলো। পথে যেতে যেতে নিজের অজ্ঞাতেই প্রিন্সের মনের কোণে ঐ কথাটা উঁকি দিয়ে গেলো– "চলরে আনন্দ, মহানন্দে ছুটে চল ....."।

আলেয়া বেগমের বাসায় এসে এরা দুইজন হাজির হলে হাতে যেন চাঁদ পেলো আলেয়া বেগম। সোল্লাসে বলে উঠলো– সোবহান আল্লাহ! তোমরা এসেছো কি আনন্দ কি আনন্দ!

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আলেয়া বেগম আলো জামালউদ্দীন প্রিন্সকে তখন লুফে নিলো তার কাজে। সেই সাথে বললো– আপাততঃ তোমরা দুইজন তোমাদের ঐ ভাড়া বাড়িতেই থাকবে। যতদিন হাতেম আলীর স্থায়ী ব্যবস্থা করতে না পারি, ততদিন অতিরিক্ত অর্থ দেবো যাতে করে তোমাদের দুইজনের স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

সবশেষে এ পক্ষও জানালো যে, ওয়ার্ক্‌শপের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। এক সপ্তাহ পরেই জামালউদ্দীন প্রিন্স এসে যোগদান করবে আলেয়া বেগমের কাজে। ধরাবাঁধা কথা। এর কোনো উনিশ-বিশ হবে না।

এ প্রেক্ষিতে আলেয়া বেগম পরমানন্দে বললো– শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। এক সপ্তাহ দেরী কোনো দেরীই নয়। তোমাদেরকে যে আমি পেলাম, এর মূল্য আমার কাছে ঢের ঢের বেশী। এমন আনন্দও আমি দীর্ঘদিন পাইনি।

২

বাসায় ফিরে এসে হাতেম আলী এবার চেপে ধরলো জামালউদ্দীন প্রিন্সকে। বললো– আর ছাড়াছাড়ি নেই ভাইজান। আপনার অতীত আমি কিছুই জানিনে। আজ আপনাকে বলতেই হবে আপনার অতীত জীবনের কথা। অর্থাৎ এখানে আসার পূর্ববর্তী জীবনের কথা।

হাতেম আলী নাছোড়বান্দা হওয়ায় জামালউদ্দীন প্রিন্স্ অবশেষে রাজী হলো তার পূর্ববর্তী জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে। কিন্তু তার আগে সে হাতেম আলীকে

বললো– আমি আমার পূর্ববর্তী জীবন কাহিনী তোমাকে শোনাতে পারি এক শর্তে – আর তা হলো, আমার অনুমতি ছাড়া এ কাহিনী বা এর একটি কথাও তুমি আর কারো কাছে কখনো প্রকাশ করতে পারবে না। রাজী?

হাতেম আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো– জী ভাইজান, রাজী। আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার অতীত জীবনের কোনো কথা আমি কখনোও কারো কাছে প্রকাশ করবো না।

ঃ ঠিক?

ঃ জি-জি। একটা কাকপক্ষীও তা জানবে না।

ঃ তাহলে শপথ করো। তোমাকে শপথ করতে হবে।

ঃ জি। আমি আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করছি, আপনার বিনা অনুমতিতে বা অজ্ঞাতে আমি আপনার পূর্ববর্তী জীবনের কোনো কথা কারো কাছে কখনো বলবো না বা প্রকাশ করবো না।

ঃ তা করলে, তুমি তো গুনাহ্গার হবেই, সেই সাথে আমার সমস্ত পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যাবে, আর তুমি আমার কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে। বুঝেছো?

ঃ তওবা-তওবা! আপনার কাছে বিশ্বাসঘাতক হওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেন মরণ দেন। আমার যেন মৃত্যু হয়।

ঃ সাব্বাস্! তাহলে শোনো–

জামালউদ্দীন প্রিন্স তার জীবন কাহিনী বিধৃত করতে লাগলোঃ

আমি একজন বিপুল সম্পদশালী পিতার একমাত্র সন্তান। ইংরেজিতে অনার্স আর এম.এ. পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করায় ইউনিভারসিটির কর্তৃপক্ষ আমাকে ইউনিভারসসিটিতে ইংরেজির শিক্ষক করে নিতে আগ্রহী হলেন। কিন্তু–

কথা শেষ করতে না দিয়েই হাতেম আলী বিপুল উল্লাসে বলে উঠলো– কি তাজ্জব – কি তাজ্জব! আপনি ইংরেজিতে এম. এ পাশ! কি আশ্চর্য! তাইতো আপনি এত সুন্দর সুন্দর ইংরেজি বলতেন!

জামালউদ্দীন প্রিন্স নাখোশ কণ্ঠে বললো– ওহো! এই টুকুতেই এত উদ্বেলিত হয়ে উঠলে, তুমি তো তোমার ওয়াদা রক্ষা করতে পারবে না।

ঃ জি?

ঃ যা বলেছি, বলেছি। আর বোলবোনা!

ঃ সেকি– সেকি! দোহাই ভাইজান! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি কথা দিচ্ছি, আর আমি উদ্বেলিত হবো না। আমি চুপ্চাপ্ শুনে যাবো।

ঃ হ্যাঁ, চুপ্চাপ্ থাকো। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে আর প্রয়োজনে কথা বলবে। উদ্বেলিত হয়ে উঠে কোনো কথা বলবে না।

ঃ জি আচ্ছা– জি আচ্ছা।

আবার শুরু করলো জামালউদ্দীন প্রিন্স ঃ

ইউনিভারসিটি আমাকে নিতে চাইলো বটে, কিন্তু আমার আব্বা তাতে মোটেই রাজী হলেন না। আমার আব্বা প্রবল আপত্তি তুলে বললেন– এখনই শিক্ষকতায় লেগে যাওয়া কেন? আগে বিলেত থেকে পি.এইচ.ডি. করে এসো, তারপর শিক্ষকতা করো।

আমি বললাম– ইউনিভারসিটিতে থাকলে আমি ফরেন স্কলারশিপ পাবো আর সেই টাকাতেই বিলেত থেকে পড়ে আসতে পারবো। আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড আমাকে জোর দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন।

ঃ তার অর্থ?

ঃ অর্থ, ঘরের টাকা লাগবে না।

ঃ তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। আল্লাহর রহমে অর্থের অভাবনেই আমাদের। ঘরের টাকা লাগলে অসুবিধে কি?

ঃ না, মানে–

ঃ কোনো মানে নেই। কবে কোন্‌দিন ফরেন স্কলারশিপ পাবে তুমি আর সেই আশাতে বসে থাকবে? চার বছর পাঁচ বছরও লাগতে পারে ফরেন স্কলারশিপ পেতে। অথচ ঘরের টাকায় এখনই বিলেত গেলে তুমি তার আগেই পি.এইচ্.ডি. করে ফিরে আসতে পারবে।

পিতামাতার হাত এড়াতে না পেরে আমি তখনই ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। ইংল্যাণ্ডে যে কয়টা ইউনিভারসিটি আছে শুনলাম, সাহিত্য সংস্কৃতির দিক দিয়ে অক্সফোর্ড ইনিভারসিটি সব কটার সেরা। তাই অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ভর্তি হলাম। বুঝতে পেরেছো?

জবাবে হাতেম আলী বললো– জি ভাইজান, জি-জি।

ঃ অতঃপর তিন বছরের মাথায় আমি কৃতিত্বের সাথে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করলাম। এই সময় সেখানে এক ইংরেজির শিক্ষক ছয় মাসের ছুটিতে গেলেন। আমার ফলাফলে খুশী হয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ আমাকে ছয়মাস কাল অধ্যাপনা করার প্রস্তাব দিলেন। আমাকে জানালেন, অনেকদিন এ দেশে না থেকো, এই ছয়টা মাস উনার স্থলে তুমি অধ্যাপনা করলে আমরা খুশী হবো। অক্সফোর্ড ইউনিভরসিটিতে অধ্যাপনা করার চান্স পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম আর সেখানে শিক্ষকতা করা শুরু করলাম।

জামালউদ্দীন প্রিন্স থামলে হাতেম আলী বললো-- তারপর ভাইজান?

ঃ কি? উদ্বেলিত হচ্ছো?

ঃ জি ভাইজান! আপনি ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিরও শিক্ষক ছিলেন, এটা কি কল্পনা করা যাবে? যারপর নেই তাজ্জব হয়ে আমার তো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠার ইচ্ছে হচ্ছিলো।

ঃ তারপর?

ঃ কিন্তু আপনার নিষেধ আছে হেতু আমি আমার তামাম আবেগ সম্বরণ করে রেখেছি। এরপর কি হলো, দয়া করে বলুন।

ঃ হ্যাঁ, বলছি। কিন্তু তুমি এই রকম মাঝে মাঝে "হুঁ-হুঁ। করো। অধিক উচ্ছ্বাসিত না হয়ে, প্রশ্ন করো মাঝে মাঝে।

ঃ ভাইজান!

ঃ একেবারে চুপ্ থাকলে কি কাহিনী শোনানো যায়?

ঃ জি আচ্ছা– জি আচ্ছা। এরপর?

ঃ এরপরই শুরু হলো আসল নাটক। দেশে কলেজে পড়ার কালে লুৎফর রহমান নামের আমার এক কলেজ ফ্রেন্ড হঠাৎ এসে দেখা করলো আমার সাথে এবং একটা ছবি আর একখানা চিঠি বের করে বললো– প্রিন্স, তোমার দেশে ফিরতে দেরী আছে, আমি এখনই দেশে ফিরে যাচ্ছি।

বললাম– এখনই? তোমার পড়াশুনা?

লুৎফর রহমান বললো– এম.ফিল্. করলাম, আর করা হলো না।

ঃ কেন- কেন?

ঃ আমার বিয়ে। এই যে কনের ছবি আর চিঠি। দ্যাখো তো, চিনতে পারো কিনা?

ছবি দেখে বললাম– আরে–আরে। এটাতো মিল্কী। মর্জিনা বেগম মিল্কী। আমাদের সাথেই তো সে পড়তো।

লুঃফর রহমান বললো– হ্যাঁ, পড়তো। তবে পড়াশুনা সে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে একজন শিল্পী ফাংশানে ফাংশানে নাচে আর গায়।

ঃ তাকে বিয়ে করার জন্যে তুমি পি.এইচ.ডি না করে ছুটে যাচ্ছো দেশে?

ঃ কি করবো? তার যে তর সইছে না। এই দ্যাখো, কি আবেগভরা চিঠি লিখেছে সে। কয়েক মাস আগে লেখা। এম.ফিল্.টা কমপ্লীট করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারিনি। এখন যাচ্ছি।

ঃ কিন্তু এখনও কি সে তোমার অপেক্ষায় আছে? শিল্পী মানুষ। নাচগান করা মেয়ে। ইতিমধ্যে কারো সাথে গেঁথে যায়নি তো সে?

ঃ না-না, তা সে যেতেই পারে না। সে পথ আর খোলা নেই।

ঃ কি রকম? এতজোর দিয়ে কি করে বলছো তুমি?

ঃ প্রিন্স্, আমরা দুইজন, মানে মিল্কী আর আমি পরস্পরের ক্লোজ ফ্রেণ্ড। এক সাথে ড্রিংক্ করা আর লিভ্টুগেদার করা ফ্রেণ্ড। অন্যের সাথে গেঁথে যাবে কি করে?

ঃ কি তাজ্জব! লিভ্‌টুগেদারও করেছো তোমরা?

লুৎফর রহমান হাসতে হাসতে বললো– তো আর বল্‌ছি কি দোস্ত! আইন মোতাবেক না হলেও, আমরা দুইজন তো আসলেই স্বামী আর স্ত্রী। আইন মোতাবেক করার জন্যেই আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছি।

এরপর লুৎফর রহমান বললো– তুমি দেশে গেলে, আমাদের ঘর-সংসার দেখার জন্যে অবশ্যই যাবে কিন্তু। আমি অগ্রিম দাওয়াত করে যাচ্ছি।

অতঃপর চলে গেলো লুৎফর রহমান। জামালউদ্দীন প্রিন্স্ হাতেম আলীকে বললো– কিছু বুঝলে?

হাতেম আলী স্মিতহাস্যে বললো– জি ভাইজান, বুঝেছি।

ঃ লিভ্‌টুগেদারের মানে বুঝো?

শরমে মাথা নীচু করলো হাতেম আলী। বললো– জি ভাইজান, কয়েকজনের কাছে এর অর্থ শুনেছি।

ঃ সাব্বাস্।

চলে যাচ্ছে দিন। কেটে যাচ্ছে একের পর এক মাস। আমি অধ্যাপনা করছি আর অবসর সময়ে ড্রাইভিং শিখছি। সপ্তাহে একদিন করে স্যুটিংক্লাবে গিয়ে পিস্তল-বন্দুক চালাচ্ছি। ব্যস্ নো ঝামেলা। কিন্তু–

কথার মাঝেই হাতেম আলী বলে উঠলো– সেকি ভাইজান! সেখানে ড্রাইভিং শিখেছেন?

ঃ হ্যাঁ, বন্দুক-পিস্তল ছোড়াও শিখেছি সেখানে।

ঃ তাজ্জব! তারপর?

ঃ এরই মধ্যেই হঠাৎ একদিন ফজল তালুকদার নামে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো– প্রিন্স্, তোমার তো দেশে ফিরতে দেরী আছে শুনছি। তাই আমি তোমাকে দাওয়াত দিতে এলাম।

বললাম– দাওয়াত! কিসের দাওয়াত?

ফজল তালুকদার বললো– আমার বিয়ে। মিল্কীকে চিনতে তো? মর্জিনা বেগম মিল্কী? ওর সাথে আমার বিয়ে।

বললাম– কি তাজ্জব! কবে?

ফজল তালুকদার বললো– মিল্কী জোর তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছে– এখনই যাওয়ার জন্যে। নইলে তার বাপ নাকি তাকে অন্যত্র শাদি দিয়ে ফেলবে। আর দেরী করবে না।

বললাম– কিন্তু এর মধ্যে তো ওর বাপ ওকে শাদি দিয়ে ফেলেননি?

ফজল তালুকদার বললো– কি করে ফেলবে? মিল্কী তো তাতে রাজী হবে না। কারণ আমরা যে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে গোপনে ঘর করা মানুষ।

শুনে আমার আক্কেল গুরুম হয়ে গেলো। আমি চুপ্ মেরে গেলাম। আমাকে নিরুৎসাহ দেখে ফজল তালুকদার আর দুচার কথা বলার পর চলে গেলো।

আমাকে নীরব দেখে হাতেম আলী বললো– সেকি ভাইজান, এই তালুকদারও ঐ একই মেয়েকে শাদি করবে?

আমি বিষণ্নকণ্ঠে বললাম– শুনলে তো! তাই করবে।

ঃ এ আবার কেমন তালুকদার ভাইজান?

ঃ আরে দূর-দূর! এসব নকল তালুকদার।

ঃ নকল?

ঃ ইংরেজরা কি মুসলমান কাউকে তালুকদার জমিদার বানিয়েছিলো? কদাচিত্ দুই একজন চাটুকারকে বানালেও ভুরি-ভুরি বানায়নি।

ঃ ভাইজান!

ঃ দেশে যে এত অসংখ্য তালুকদার দেখছো, এরা প্রায় সবই নকল তালুকদার। এদের বেশীর ভাগই ইংরেজদের খাজনা আদায়ের কাচারীর তলবদার ছিলো। এরা খাজনা দেয়ার জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রজাদের তলব অর্থাৎ তাগাদা দিয়ে বেড়াতো। সেই তলবদার পদবীকে তারা নিজেরাই তালুকদার বানিয়ে নিয়েছে। খোঁজ নিলেই দেখতে পাবে, এদের কোথাও আর কখনো কোনো তালুক ছিলো না।

ঃ তারপর আপনি কি করলেন ভাইজান? ঐ অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে কত ছিলেন?

ঃ বেশিদিন নয়। আট-নয় মাস যেতেই আমারও তলব এলো দেশ থেকে। আমার আব্বা আমাকে বাড়িতে ফিরে আসার জন্যে জোর তাকিদ পাঠিয়ে দিলেন।

ঃ কেন-কেন? কোনো দুর্ঘটনার খবরটবর নাকি।

ঃ হ্যাঁ, দুর্ঘটনাই বলতে পারো। দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলবো একে?

ঃ কেমন-কেমন?

ঃ আমাকে শাদি দেয়ার জন্যে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ঃ শাদি দেয়ার জন্যে? তাহলে দুর্ঘটনা কেন ভাইজান? এতো আনন্দের ব্যাপার।

www.boighar.com

ঃ জি না, আনন্দের ব্যাপার নয়, চরম দুঃখের ব্যাপার। আমাকে ঐ মর্জিনা বেগম মিল্কীর সাথেই শাদি দেয়ার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি।

ঃ সেকি! কি গজব– কি গজব! ঐ মর্জিনা বেগম মিল্কীর সাথে?

ঃ হ্যাঁ, ঐ বাজারে মেয়ে মিল্কীর সাথেই।

ঃ কি তাজ্জব! এটা কি করে সম্ভব হলো!

ঃ মিল্কীর বাপ একটা মস্তবড় চা বাগানের মালিক, অর্থাৎ ধনাঢ্য ব্যক্তি, আর আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের শিশুকালেই তারা নাকি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলো মিল্কীর সাথে আমার শাদি দেয়ার জন্যে। মিল্কীর বাপের যারপর নেই তাগিদেই আমার আব্বা আমাকে বিলেত থেকে ফিরিয়ে আনলেন এই শাদি দিতে।

ঃ কি আশ্চর্য! মিল্কীর বাপ জানতেন না তাঁর মেয়ের চরিত্রের কথা?

ঃ ঐ হুটপাটের সময় অন্যের মুখে শুনলাম– সেটা জানতে পেরেই মেয়ের বাপ আমার সাথে তাঁর মেয়ের শাদি দেয়ার জন্যেই তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। বাপের মুখে চুণকালী দিয়ে তাঁর মেয়ে কোনো এক লম্পট নাগরের সাথে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলো। এটা জানতে পেরেই মিল্কীর বাপ এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

ঃ ভাইজান।

ঃ মেয়ে নাকি দুই দুই বার গর্ভপাতও করেছিলো। আমার শোণা কথা।

ঃ নাউজুবিল্লাহ! কি তাজ্জব ভাইজান! এযে ভানুমতির খেলকেও হার মানায়। তারপর কি ঘটলো?

ঃ আমি বাড়ি ফিরে আসার সাথে সাথে আমার আব্বা-আম্মা মিল্কীর বাপের প্ররোচনায় তখনই মিল্কীর সাথে আমার শাদি দিতে উদ্যত হলেন।

ঃ তারপর?

ঃ আমি যতই আপত্তি তুললাম, তাঁরা ততই আমার আপত্তি নাকোচ করে আমার উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করলেন। মিল্কীর চরিত্রের কথা তুলে ধরার পরও, ওটা শত্রুর রটনা বলে উড়িয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁদের চাপ বাড়াতেই লাগলেন। শুরু হলো রশি টানাটানি।

www.boighar.com

ঃ আচ্ছা! তারপর ভাইজান!

ঃ তারপর ছিঁড়ে গেলো রশি। আমি কিছুতেই রাজী হলো না দেখে, আমার আব্বা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আমকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। আমি আমার আম্মার দিকে তাকালেও আমার আম্মা ক্রোধভরে বললেন– বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। তোমার মতো অবাধ্য সন্তানের আমি মুখ দেখতে চাইনে। অতঃপর আমি চলে যাচ্ছি দেখে তাঁরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন– "আমাদের পয়সার বিদ্যাকে বেচে খাবে তো হারাম খাবে।"

ঃ সেকি ভাইজান? তারা এমন দিব্বিই দিলেন?

ঃ হ্যাঁ, এমন দিব্বিই দিলেন। তাই তো আমি আমার লেখাপড়ার কথা স্বীকার করতে পারি নি, আর কোনো অফিস-আদালতে চাকুরী-বাকুরী গ্রহণ করতে পারিনি।

ঃ হায় আল্লাহ! এতদিনে বুঝতে পারলাম, আপনার বাধা কোথায়! তারপর ভাইজান, তারপর?

ঃ তারপরের কথা তো তোমাকে বলেছিই। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব যেমন 'ব্যোম্ কেদারনাথ' বলে ঢুকে পড়েছিলেন পল্টনে, আমিও তেমনি 'ব্যোম্ কেদারনাথ' বলে নেমে পড়লাম পথে আর পরমানন্দে বলে উঠলাম- "চল্‌রে প্রিন্স্ মহানন্দে ছুটে চল্, খুঁজে নিবি তোর চিরানন্দময়ে"।

ঃ বাপ্‌রে বাপ! কি দারুণ কাহিণী। অতঃপর ভাইজান?

ঃ অতঃপর আমার শুধু দুর্ভোগের কাহিণী। এক কাপড়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। একটা পয়সাও ছিলো না পকেটে। তবুও ঐ ভাবেই ষ্টেশানে ছুটে এসে উঠে পড়লাম দ্রুতগামী মেলট্রেনে। সীটে না বসে সটান শুয়ে পড়লাম বাংকের উপর। সারাদিনের ধক্কলের কারণে শুয়ে পড়ার সাথে সাথে চেপে ধরল ঘুমে। আর একটানা ঘুমে কেটে গেলো রাত। সকাল বেলা ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দেখি আমার পেট চুঁ-চুঁ করছে ক্ষুধায়। বুঝতে পারলাম সত্বর আমার কিছু খাওয়ার দরকার। কিন্তু দরকার হলে কি হবে, খাবার কেনার পয়সা কৈ?

ঃ ভাইজান।

ঃ বাংক্ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে এলাম আর কিভাবে পয়সা উপায় করা যায় ভাবতে লাগলাম। ভাগিগস্, চেকার এসে এই সময় টিকিটের জন্যে বাড়তি কোনো ঝামেলা পয়দা করলো না। সে যাই হোক, পয়সা উপায়ের কথা ভাবতেই দেখি, কয়েকজন ভিক্ষুক ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। অধিকাংশ লোক না দিলেও দেখলাম, দুইচারজন কিছু কিছু পয়সা হাতে তাদের দিচ্ছে। বুঝলাম, পয়সা উপায়ের সবচেয়ে সহজ পথ এটাই। কিন্তু আমি তো তাই বলে ভিক্ষুক সাজতে পারিনে। ক্ষুধার জ্বালায় মরে গেলেও পারিনে। আমি পয়সা উপায় করতে চাই শ্রম বেচে। ক্ষেতে খামারে কাজ করে, মাটি কেটে, ইট ভেঙ্গে। আমি খেটে খেতে চাই। বুঝতে পরেছো?

ঃ জি ভাইজান, জি জি। বলে যান।

ঃ খেটে খেতে তো চাই, কিন্তু এই ট্রেনের মধ্যে খাটবো কোথায়, মাটি কাটবো কোথায়, ইট ভাঙ্গবো কোথায়? ভেবে আমি যখন দিশেহারা, সেই সময় ট্রেন এসে একটা স্টেশানে থেমে গেলো আর যাত্রিদের মধ্যে "কুলি-কুলি" বলে ডাক হাঁক শুরু হলো। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে আমার সামনেই ছিম্‌ছাম্ পোশাক পরা এক ভদ্রওলোক অনেকগুলো ব্যাগ-বাক্সো নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন আর "কুলি-কুলি" বলে ডাকতে লাগলেন। সংগে সংগে অকুলে কুল পেয়ে গেলাম আমি। 'ইউরেকা' বলে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ভদ্রলোকের ব্যাগ বাক্সো। বললাম– আমাকে দিন স্যার, আমি এগুলো নামিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– নামিয়ে দিচ্ছি মানে?

বললাম– মানে, যেখানে বলবেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবো। দয়া করে অন্য কুলি ডাকবেন না।

আমার চেহারা দেখে ভদ্রলোক ফের প্রশ্ন করলেন– অন্য কুলি ডাকবো না মানে? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই তুমি কুলি নও?

বললাম– হ্যাঁ স্যার, তা নই তবে এক্ষণে কিছু পয়সার আমার একান্ত দরকার।

ভদ্রলোক বললেন– কিন্তু পয়সার দরকার? তাহলে কত পয়সা দিতে হবে তোমাকে?

বললাম– আপনি দয়া করে যা দেবেন, তাই নেবো স্যার। যতকম পয়সাই হোক। আমার কোনো চাহিদা নেই।

এই সময় ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়লো। ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন– ঠিক আছে ঠিক আছে। শিগগির এগুলো নিয়ে নেমে এসো–

সমস্ত ব্যাগ বাক্সো কাঁধে-পিঠে আর মাথায় তুলে নিয়ে নেমে এলাম ট্রেন থেকে এবং ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে এসে প্লাটফরমের একটা ফাঁকা জায়গায় দাড়ালাম ও ভদ্রলোকের নির্দেশে সেখানেই ব্যাগ বাক্সো নামালাম।

এবার ভদ্রলোক বললেন– হঠাৎ কুলিগিরি করে তোমার পয়সা উপায়ের দরকার হলো কেন?

বললাম– ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে স্যার। কিন্তু হাতে একটা পয়সা নেই। কাজেই, কিছু পয়সা পেলে মুড়িমুড়কি যা হোক কিছু কিনে খেয়ে পানি খেলে পেটটা ঠাণ্ডা হবে।

ঃ তাজ্জব! বাড়ি কোথায় তোমার?

ঃ অনেক দূরে। এখান থেকে ছয়-সাত জেলার ওপারে স্যার। তবে এখন আর সেখানে আমার কোনো বাড়িঘর নেই।

ঃ বলো কি! সেখানে তোমার বাপ-মা, ভাইবেরাদার, আত্মীয় স্বজন কেউ নেই?

ঃ না স্যার! আমাকে আশ্রয় দেয়ার মতো কেউ নেই।

ঃ তাইনাকি? তাহলে এদিকে এসেছে কেন?

ঃ কাজের খোঁজে স্যার। থাকার বাড়িঘর নেই, হাতে পয়সা নেই, বেঁচে থাকার জন্যে খেটে খাওয়া ছাড়া আমার আর পথ কি স্যার? বাড়িঘর নেই, যেখানে রাত সেখানে কাত হলেই চলে যাবে। কিন্তু খাওয়ার জন্যে তো কাজ করতেই হবে আমাকে। তাই কাজের খোঁজে আমি এদিকে এসেছি।

ঃ কাজের খোঁজে? কি কাজ করবে তুমি?

ঃ যে কাজ পাই সেই কাজই স্যার। ক্ষেত খামারের কাজ হোক, মাটি কাটা ইটভাঙ্গা হোক, যেটা পাবো, সেটাই করবো।

ঃ আচ্ছা। তা ক্ষেত খামারের কাজ করতে হলে তোমাকে এখান থেকে অনেক দূরে গ্রামগঞ্জে চলে যেতে হবে। মাটিকাটা ইটভাঙ্গার কাজ অবশ্য এখানেই পাবে।

ঃ এখনেই পাবো? তাহলে এখানেই আমি থাকবো স্যার। দূরে গ্রামগঞ্জে যেতে আর মাঠে ক্ষেতে কাজ করতে মন চায়না আমার।

ঃ মাটি কাটবে-ইট ভাঙ্গবে?

ঃ জি-জি।

ঃ তোমার চেহারাটা তো মারাত্মক। লেখাপড়া কি কিছু জানোনা?

ঃ জানি স্যার, ক. ব. ঠ কিছু জানি। কিন্তু ও লেখাপড়া দিয়ে অফিস-আদালতে চাকুরী পাওয়া তো দূরের কথা, একটা পিওন-চাপ্‌রাশীর পদও পাবো না।

ঃ ও আচ্ছা তা তোমার নামটা তো জানা হলো না?

ঃ সে কথা আর কি বলবো স্যার? নাম আমার জামালউদ্দীন প্রিন্স। বাপ-মায়ে নাম রাখলেন 'প্রিন্স'। কিন্তু তাঁরা কি জানতেন মজুর খাটবে প্রিন্স তাঁদের।

ঃ ভেরী স্যাড্। তা ইট ভাঙ্গা-মাটি টানা ছাড়া আর কোনো কাজ করতে চাও না?

ঃ চাই স্যার চাই। যত শক্ত কাজই হোক, এই মুহূর্তে একটা কাজ পেলেই আমি বর্তে যাবো।

ঃ আমার একটা ওয়ার্কশপ আছে। গাড়ি বিকল হয়ে গেলে সেখানে মেরামত করা হয়। সেখানে কাজ করবে?

ঃ ওয়ার্কশপের কাজ? ওহ! খুব ভালো হয় স্যার– খুব ভালো হয়। দয়া করে আমাকে সেখানেই লাগিয়ে দিন স্যার।

ঃ তুমি রাজী থাকলে, সেখানেই লাগিয়ে দেবো তোমাকে। আর কিছু না পারো, সেখানে লেবারের কাজটা তো করতে পারবে।

ঃ পারবো স্যার, সব পারবো। দয়া করে আমাকে সেখানেই কাজ দিন স্যার। আমার একান্ত অনুরোধ আমাকে সেখানেই লাগিয়ে দিন।

আমি দুই হাত জোর করলাম। ভদ্রলোক বললেন– অল্-রাইট, তুমি আমার ঐ ওয়ার্ক্‌শপেই কাজ করবে। এবার যাও, ঐ যে প্ল্যাট্‌ফরমের ওখানে খাওয়ার একটা স্টল দেখছো, ওখানে ভাত-মাছ সব পাওয়া যায়। এখানে গিয়ে পেটভরে খেয়ে এসো।

আমি কাঁচুমাঁচু করে বললাম– না স্যার, ওখানে খেতে যেতে পারবো না। ভাত মাছ খাওয়ার মতো পয়সা আমার কাছে নেই। আমার মালপত্র বয়ে দেয়ার জন্যে যে দু'চার পয়সা দেবেন, তাই দিন স্যার। আমি মুড়িমুড়কি খেয়ে একটু পানি খাই।

ভদ্রলোক এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন– ভাতমাছ খেতে পয়সা যা লাগে তা আমি দেবো। তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি হুকুম করছি। তুমি আমার হুকুম তামিল করো।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে আর দ্বিমত করার সাহস আমার হলো না। পেটও আমার জ্বলে যাচ্ছে ক্ষুধায়। তাই, পড়িমরি তখনই ছুটে গেলাম খেতে।

এরপর ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে ট্যাক্সী যোগে সরাসরি চলে এলেন তার ওয়ার্কশপে। সেখানে এসে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি এক ছেলেকে বললেন– হাতেম আলী, এই লোক এখন থেকে এই ওয়ার্ক্শপে কাজ করবে। একে তুমি কাজে লাগিয়ে দাও।

অতঃপর থেমে গেলো জামালউদ্দিন প্রিন্স্। হাসতে হাসতে হাতেম আলীকে বললো– এরপর তুমি তো সবই জানো। হাতেম আলী বিপুল উল্লাসে বললো– জানি মানে কি ভাইজান, সেদিনের কথা আমি জীবনেও ভুলব না। ওয়ার্ক্শপের মালিককে আমি বললাম– এ লোক ওয়ার্ক্শপে কি কাজ করবে স্যার?

মালিক গরম কণ্ঠে বললেন– কিছু না পারুক, লেবারের কাজটা তো করতে পারবে।

সেই সাথে আরো বললেন– এখন থেকে এলোক তোমার সাথেই থাকবে আর তোমার সাথেই খাবে। খাওয়ার পয়সা আমি দেবো। পরে আস্তে আস্তে নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নেবে।

এই বলেই চলে গেলেন ওয়ার্ক্শপের মালিক। জামালউদ্দীন প্রিন্স ফের হাসতে হাসতে বললো– তারপর তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য ভরে লাগিয়ে দিলে পড়ে থাকা ছিঁড়ে ছুটা তার গুছানোর কাজে।

ঃ জি-জি! আমি কি তখন জানি যে, আপনি গাড়ির এত বড় একজন ডাক্তার। সেদিন এক ম্যাকানিক্স্ এক গাড়ির ঢাকনা খুলে দুই ঘণ্টা যাবত কটর মটর করছিলো। কিন্তু মরা গাড়িতে প্রাণ আনতে পারছিলো না। তা দেখে আপনি ছুটে গিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন আর হাত দিলেন ইঞ্জিনে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই মরা গাড়ি ডেকে উঠল গঁ গঁ করে। বাপরে বাপ্ কি তাজ্জব হাত!

জামালউদ্দীন প্রিন্স বললো– হবে না? বিলেতে ট্রেনিং নেয়া হাত।

ঃ ভাইজান!

ঃ আচ্ছা, এবার ক্ষান্ত দাও তো। অতীত বাদ দিয়ে বর্তমান নিয়ে ভাবো।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ, সেই সেদিনের মতো পেট যে আবার ক্ষুধায় চুঁচুঁ করতে লাগলো।

খেয়ালে এসে হাতেম আলী বললো– জি ভাইজান আমার পেটও আর'র' মানছেনা। কিন্তু এখন আর পাক করে খাওয়ার অবস্থা নেই ভাইজান। চলুন হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি। ও বেলার খানা পাক করেই খাবো।

জামালউদ্দীন প্রিন্স উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো– ব্যোম্ কেদারনাথ! তাই সই চলো–

৩

ওয়াদা মাফিক ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হাতেম আলীকে সাথে নিয়ে আলেয়া বেগম আলোর কাজে যোগ দিতে চলে এলো জামালউদ্দীন প্রিন্স্। তাদের দেখেই আলেয়া বেগম আলো উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো– এই যে, তোমরা এসেছো? বহুৎ খুব–বহুৎ খুব।

হাতেম আলী বললো– কি ম্যাডাম, আমার এই ভাইজান এক কথার মানুষ। উনি বলেছিলেন, এক সপ্তাহ পরেই উনি আপনার কাজে যোগ দিতে আসবেন। ঠিক তাই এসেছেন।

আলেয়া বেগম বললো– সাবাস্–সাবাস্! আমারও ধারণা ছিলো আজ কালের মধ্যেই এসে যাবে তোমরা। তা হাতেম আলী?

ঃ জি ম্যাডাম, বলুন?

ঃ আমার কাজের ধরণটা বুঝিয়ে দিয়েছো তো তোমার ভাইজান এই মিঃ প্রিন্স্কে? কাজ আমার মোটেই কোনো কঠিন কাজ নয়। অত্যন্ত হালকা পাত্লা কাজ। নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া কোনো দূর-দূরান্তে তাকে গাড়ি চালাতে হবে না। সব সময় এই আশেপাশেই চালাতে হবে গাড়ি। আমার কাজ এই এলাকাতেই। মানে, আমাদের এই মহল্লাতেই।

ঃ জি ম্যাডাম, সেটা অনুমান করেই আমি তাকে সব বলেছি।

এবার প্রিন্স্কে লক্ষ্য করে আলেয়া বেগম বললো– তা মিঃ প্রিন্স এতে কি কোনো অসুবিধা হবে তোমার? আমার কাজ সব নিকটেই।

জামালউদ্দীন প্রিন্স্ নত মস্তকে ছিলো। ঐ নত মস্তকেই বললো– দূর হলেও কোনো অসুবিধা হবে না ম্যাডাম। দূরে-নিকটে, শহরে-পল্লীতে, ইনশাআল্লাহ কোথাও গাড়ি চালাতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

ঃ বলো কি! তুমি এতটাই দক্ষ?

ঃ দক্ষ না হলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে শোনো–

ঃ জি ম্যাডাম, বলুন?

ঃ কি করে বলবো? সব সময় চোখ নীচের দিকে থাকলে, কথা বলি কি করে?

এবার হাতেম আলী হেসে বললো– উনি ঐ রকমই ম্যাডাম। মুখ ঢাকা না থাকলে, অর্থাৎ মুখে নেকাব বা বোরকা না থাকলে, উনি কম বয়সী মেয়েছেলেদের মুখের দিকে স্বভাবতঃই চোখ তুলে তাকান না।

আলেয়া বেগম বললো– আই-সি! ঠিক আছে– ঠিক আছে। এটা আমার বাড়ি তাই শুধু উড়নাটাই মাথার উপর রেখেছি। বাইরে বেরুলে এ অসুবিধা থাকবে না।

প্রিন্স্ বললো– বলুন ম্যাডাম?

আলেয়া বেগম বললো– আজ প্রথম দিন। এই সামনেই এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি, চলো–। গ্যারেজে গাড়ি আছে। তুমি গিয়ে গাড়িটা আমাদের এই গেটের কাছে আনো। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

ঃ জি আচ্ছা ম্যাডাম।

গ্যারেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলো জামালউদ্দীন প্রিন্স্। আলেয়া বেগম হাতেম আলীকে বললো– তোমার ব্যবস্থাও যত সত্বর পারি আমি করে ফেলবো। এখন কিছুদিন তুমি তোমাদের ঐ ভাড়া বাড়িতেই থাকো আর পাকশাক করে সময় কাটাও।

ঃ জি আচ্ছা ম্যাডাম।

ঃ পাক শাকের কাজে তুমি নাকি উস্তাদ?

ঃ উস্তাদ কিনা, জানিনে। তবে ওকাজটা পারি আমি আর ও কাজটা করতে আমি আনন্দও পাই।

ঃ আচ্ছা। তাহলে ঐ আনন্দে নিয়েই আপাততঃ কাটিয়ে দাও। কিছুদিন। এর বেশি আর তো কিছু করার নেই।

ঃ আছে ম্যাডাম, আছে। ওয়ার্কশপের কাজের চপে যে কাজটা আমার প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে, সে কাজটা এখন আমি হাত-পা ছড়িয়ে বসে করবো।

ঃ ওমা! সে কাজ আর কোনো কাজ?

ঃ পুথি পাঠ ম্যাডাম, পুথিপাঠ। দীর্ঘদিন ধরে আমার ঐ কেতাবটা বাক্সো বন্দী হয়ে আছে। এখন অনন্ত অবসর। এবার আমি মনের আনন্দে বসে বসে কেতাব পাঠ করবো।

ঃ কেতাব? কি কেতাব?

ঃ জঙ্গনামা ম্যাডাম, জঙ্গনামা।

ঃ ও আচ্ছা! ঐযে "দুধে-জলে তিরিশ মণ করিয়া জলপান, আশি মণ খানা খায় বিবি সোনাভান"– এই কেতাব?

ঃ জি-জি। লেখাপড়া তো বেশী শিখিনি, তবে এসব কেতাব, সারি-পাঁচালী আর মর্সিয়া গানের খেতাব আমি ছরছর করে পড়তে পারি।

ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু একা একা ওসব কেতাব কতক্ষণ পাঠ করবে তুমি? পাশে শ্রোতা কেউ না থাকলে, একা বসে ওসব কেতাব পাঠ করার কতক্ষণ ধৈর্য থাকবে তোমার?

ঃ কে আর কি করবো ম্যাডাম! দোকা যখন কেউ নেই, তখন একা বসেই পাঠ করবো কিছুক্ষণ। তাতেও আমার ফাঁপড়টা কিছু কাটবে।

আলেয়া বেগম সহাস্যে বললো– যাঃ বাবা! দোকার অভাবটা মনে বিঁধ্ছে বুঝি? মানে, দোকা হওয়ার বুঝি সাধ জাগছে মনে তোমার?

হাতেম আলী চম্‌কে উঠে বললো– এ্যাঁ! ছিঃ! ছিঃ! কি যে বলেন ম্যাডাম! ঐযে কথা বলে, নিজের শোয়ার জায়গা নেই, শংকরীকে কয় মধ্যে শো"– সেই কথারই যে ব্যাপার হলো! নিজে কোথায় খাই-শুই সেই ব্যবস্থাই করতে পারিনি, তাতে আবার দোকা!

ঃ হবে-হবে। সব হবে। আমিই সব ব্যবস্থাই করে দেবো। তোমাকে ভাবতে হবে না কিছুই।

ঃ ম্যাডাম।

ঃ এখন তুমি বাসায় যাও। আমি যাই, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরোই। তোমার ভাইজান গাড়ি নিয়ে বসে আছে। প্রথম দিনেই তাকে অধিক অপেক্ষায় রাখলে, বেচারা অন্যরকম ভাবতে পারে।

দ্রুত পদে ভেতরে চলে গেলো আলেয়া বেগম আলো।

প্রথম দিন অল্প কিছুদূর ঘুরে ফিরে এলো আলেয়া বেগম। গাড়ি থেকে নামতে নামতে প্রিন্সকে বললো– মিঃ প্রিন্স্, কোনো ড্রাইভার না থাকায়, অনেকদিন হলো গাড়িটা ধোয়া-মোছা নেই। তাই গ্যারেজে তোলার আগে গাড়িটা একটু ধুয়ে মুছে গ্যারেজে তোলো। www.boighar.com

জামালউদ্দীন প্রিন্স বললো– জি আচ্ছা ম্যাডাম, জি আচ্ছা–

প্রিন্স গাড়িটা বাইরে দাঁড় করিয়ে ধোয়া-মোছা করতে লাগলো। আর আলেয়া বেগম আলো ভেতরে চলে গেলো। বাড়ির ভেতর ঢুকতেই হন্তদন্ত হয়ে আলেয়া বেগম আলোর পিছু নিলো দুলারী বেগম দোলা নামের আলোর এক বান্ধবী। উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগে আলেয়া বেগম তা যেসব বান্ধবীদের নিয়ে প্রসাধন সামগ্রীর এক ফেরিওয়ালাকে ঘিরে ভিড় করছিলো, এই দুলারী বেগম দোলা তাদের কেজন। এই দুলারী বেগমই সেদিন সেখানে প্রথম জামালউদ্দীন প্রিন্সকে দেখে আবেগভরে বলে উঠেছিলো– "ওমা! কি চেহারা গো! একদম রাজপুত্র।" সেইদিনই আলেয়া বেগম হাতেম আলীকে ডেকে নিয়ে আড়ালে একটু কথা বলতে লাগলে, এই দুলারী বেগম দোলাই মন্তব্য করেছিলো– "খাইছেরে। এতদিনে বেচারী বোধ হয় ডুবলো"! আরো উল্লেখ্য যে, দুলারী বেগমের মন্তব্য শুনে আলোর অন্যান্য বান্ধবীরা মন্তব্য করেছিলো– "ডুবুক–ডুবুক, ওয়ার্ক শপের কাম্‌লাকে দেখে যে ডুবে, সে রসাতলে যাক"– ইত্যাদি ইত্যাদি।

হন্তদন্ত হয়ে দোলাকে পিছু নিতে দেখ আলেয়া বেগম আলো সবিস্ময়ে বললো– একি! দোলা তুই?

কোনো ভূমিকায় না গিয়ে দোলা বিবি সরাসরি বললো– যা শুনেছিলাম, তা দেখছি একদম সত্যি! তুচ্ছ একটা ডোবাতেই ঝাঁপ দিলি তুই?

দোলার অতি আগ্রহ অনুমান করে আলেয়া বেগম আলো বললো– ঝাঁপ দিলে তুচ্ছ ডোবাতেই ঝাঁপ দেয়া ভালো। প্রয়োজনে সাঁতরিয়ে সহজেই পাড়ে উঠা যায়। সাগরে ঝাঁপ দিলে, সে সুযোগ থাকে না। সেক্ষেত্রে ঝাঁপ দেয়া মানেই জিন্দেগী শেষ।

ঃ বটে! তাহলে চেহারাটাই খেলো তোকে?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ওয়ার্ক্‌শপের ঐ দর্শনধারী কাম্‌লাটাকেই ড্রাইভার বানিয়ে নিলি তুই?

ঃ কে বললো তোকে?

ঃ বলেছে তো অনেকেই। তাছাড়া স্বচোক্ষে দেখলাম তো তা।

ঃ কোথায় দেখলি?

ঃ তোরা যখন যুগলে, সরি! একসাথে গাড়ি থেকে নেমে এলি, তখন দেখলাম।

ঃ আচ্ছা! তাহলে আদাপানি খেয়ে এই খোঁজটাই করে বেড়াচ্ছিস্ এখন?

ঃ খোঁজ করে বেড়াবো কেন? এইদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম আর হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেলো। দূর থেকে দেখতে পেলাম বলেই তো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কথা বলতে এলাম।

ঃ নতুন করে আবার নিশ্চিত হওয়ার দরকার কি? তুই তো আগে থেকেই নিশ্চিত্ হয়ে আছিস্।

ঃ হ্যাঁ, মিথ্যা বলতে চাইনে, তাই আছি। আর সে জন্যেই তোর কাছে আসতে আমি বাধ্য হলেম।

ঃ মতলব?

ঃ দ্যাখ্, তুই আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তোকে হুঁশিয়ার করে দেয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব।

ঃ হুঁশিয়ার!

ঃ হ্যাঁ। ঝাঁপ দিস্ আর না দিস্, একদম তলিয়ে যেন যাস্‌নে। শেষে বিস্তর পোস্তাতে হবে তোকে কিন্তু।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ শুধু চেহারাটা তোর মতো, মনোরম হলেও, ঐ দিয়েই চলে না সখী! কোথায় তুই আর কোথায় সে। আসমান জমিনের ফারাগ। এ দুইয়ে মিল হয় না কখনো। দুইদিনেই তোর ভুল তুই নিজেই ধরতে পারবি।

ঃ ব্যস্! ঐ ড্রাইভারের সাথে আমাকে একদম গেঁথে ফেলেই দিয়েছিস্?

ঃ গেঁথে যাতে করে না যাস্, সেই জন্য সাবধান করে দিচ্ছি।

ঃ তা দিচ্ছিস্ বেশ করছিস্। এখন যা তো! এক জায়গা থেকে এলাম, এখন ক্লান্ত আছি। আমার এই জামা-জুব্বা খুলতে দে আমাকে।

ঃ আচ্ছা যা খোল্‌গে। কিন্তু হুঁশিয়ার সখী, হুঁশিয়ার।

ঃ আমার ভাবনা আমি ভাববো। তুই দয়া করে যাবি এখন?

ঃ বেশ যাচ্ছি। তবে ভেবে করিও কাজ– এই আমার কথা। করে ফেললে আর ভেবে দেখে লাভ হবে না।

ঃ সেটা ভেবে দেখবো। এখন তুই যা–

– বলেই ঘরের ভেতর চলে গেলো আলেয়া বেগম আলো।

এতে করে অগত্যা বাসার বাইরে বেরিয়ে এলো দুলারী বেগম দোলা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দেখে, এখনও জামাল উদ্দীন প্রিন্স গাড়িটা ধোয়া মোছা করছে। এ সুযোগ আর ছাড়লো না দুলারী বেগম দোলা। প্রিন্সের কাছে এগিয়ে এসে বললো– লাভ নেই– লাভ নেই। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়লেই চাঁদ কখনো হাতে আসে না কারো।

আচম্‌কা এই প্রশ্নে জামালউদ্দীন প্রিন্স্ সবিস্ময়ে বললো– তার মানে?

ঃ মানে, হাতে হাতে ব্যথাই ধরে যায় শুধু। লাভ কিছু হয় না।

ঃ তাজ্জব! কি বলতে চান আপনি?

ঃ নৌকা তো ভিড়িয়েছে মস্তবড় ঘাটে। যাত্রী কাউকে পাবে কি শেষ পর্যন্ত।

ঃ হেঁয়ালী করছেন কেন? যা বলার স্পষ্ট করে বলুন?

ঃ তবু স্পষ্ট হলো না? বলছি– আলেয়া বেগম আলোর চোখ-ধাধাঁনো রূপ দেখেই যে তার পিছু নিয়েছো, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তাকে কি তুমি কোনোদিনই পাবে?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তাকে পাওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা আছে তোমার? কিসের বলে এমন আশা পোষণ করছো তুমি? তোমার চেহারাটাও চিত্তহারী বটে, কিন্তু ঐ একটা মাত্র পুঁজি দিয়েই কি জয় করতে পারবে তাকে?

ঃ থামুন। কি আবোল-তাবোল বক্‌ছেন? গায়ে পড়ে এমন গুনাহ্‌র কথা শুনাতে কেন এসেছেন?

ঃ গুনাহ্‌র কথা!

ঃ কে বললো আপনাকে যে, ম্যাডামকে পাওয়ার আশায় তাঁর পিছু নিয়েছি?

ঃ নইলে এত লোক থাকতে ঐ সুন্দরী তরুণীর ড্রাইভার হতে এসেছো কেন?

ঃ আমার চাকুরীর প্রয়োজন, তাই চাকুরী করতে এসেছি। কারো চেহারা দেখতে আসিনি।

ঃ তবু তোমাদের মতো সুদর্শন কামলা-কামিনদের মতলব সবাই অনুমান করতে পারে। ওয়ার্ক্‌শপের কাজ ফেলে তোমার এই ড্রাইভারী করতে আসার মাজেজা দুর্বোধ্য কিছু নয়।

ঃ কি আশ্চর্য! কে আপনি? কেন আপনি এমন অপ্রিয় কথা শোনাতে এসেছেন আমাকে?

ঃ শোনাতে এসেছি মানে, তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। ভুলেও যেন কোনো দুরাশা মনে তোমার না জাগে– সে ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি। বলতে এসেছি– তুমি যার পিছু নিয়েছো সে একটি পাহাড়। সে তুলনায় তুমি একটি উইয়ের ঢিঁপি মাত্র।

ঃ মানে?

ঃ মানে, আমার বান্ধবী এই আলেয়া বেগম আলো শুধুরূপবর্তীই নয়, বিরাট এক ধনী লোকের কন্যা সে। রূপ ছাড়াও সে মস্তবড় বিদ্বান্ মেয়ে। মানে, যাকে বলে বিদুষী, সেই বিদ্যাবতী মেয়ে সে। বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ তার পাণ্ডিত্য।

এবার আগ্রহী হয়ে উঠলো জামালউদ্দীন প্রিন্স। প্রশ্ন করলো– কি বললেন? বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ?

ঃ অসাধারণ– অসাধারণ। এমনটি সচরাচর দেখা যায় না।

ঃ বলেন কি! তা আপনি কি করে জানলেন?

ঃ আমি জানবো না মানে? আমি তার ক্লাসফ্রেণ্ড, মানে সহপাঠিনী। আমি জানবোনা?

ঃ আপনি তাঁর সহপাঠিনী? বলেন কি! কোনো ক্লাসে, মানে কোথায় আপনি তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন?

ঃ তুমি কি লেখাপড়ার সব কথা বুঝবে? মানে, তুমি কি লেখাপড়া কিছু জানো?

ঃ জানি। অতি সামান্যই জানি। তবে এ লাইনের মোটামুটি সব কথাই বুঝতে পারি।

ঃ আচ্ছা। আমি তার সহপাঠিনী ছিলাম পাঠশালায়। পাঠশালায় আমরা এক সাথে পড়েছি।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর আমি জেনারেল লাইনেই থেকে গেলাম আর আমার বান্ধবী আলো জেনারেল লাইন ছেড়ে দিয়ে হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হলো।

ঃ বলেন কি! আর আপনি?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমি ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়লাম। মাইনর পাশ করার পর না-না কারণে আর আমার পড়াশুনা হয়নি।

ঃ আর উনি? মানে, আমার ম্যাডাম?

ঃ আলো ভালোভাবেই হাই মাদ্রাসা পাশ করলো। কিন্তু কি তার খেয়াল। মাদ্রাসা লাইন ছেড়ে দিয়ে আবার সে জেনারেল লাইনে চলে এলো আর ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাশ করলো।

ঃ এ্যাঁ। বলেন কি! কি তাজ্জব! উনি ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাশ করেছেন?

ঃ কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করেছে। আর এই গত বছরই পাশ করেছে সে।

ঃ সোবহান আল্লাহ! তারপর– তারপর?

ঃ তারপর সে এখন মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা। এখানে ইংরেজি পড়ায় সে। সবাই বলে, ইংরেজির ম্যাডাম।

ঃ কি তাজ্জাব– কি তাজ্জব! উনি ইংরেজি পড়ান কলেজে?

ঃ আরো আছে। একটা ছোট মাদ্রাসারও সে অধ্যক্ষ। প্রচুর টাকা আছে তাদের। নিজেদের টাকা দিয়েই ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে একটা মাদ্রাসা খুলেছে আলো। সেখানেও সে সপ্তাহে দুইতিন দিন যায়। যায় মানে, মাদ্রাসাটার দেখ্‌ভাল্ করতে যায়। দুই একটা ক্লাস নিলেও, মাদ্রাসায় নিয়োজিত শিক্ষয়িত্রীরাই সকল ক্লাস নেয়।

জামালউদ্দীন প্রিন্স্ খোশ্‌কণ্ঠে বললো– কেয়াবাত্ কেয়াবাত্!

দুলারী বেগম দোলা শক্ত কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, বাতটা কেয়াই বটে। মর্তের মানুষ হয়ে আসমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে থেকে খামাখা হয়রান হতে যেওনা, বুঝলে?

ঃ জি ম্যাডাম, বুঝেছি-বুঝেছি। তা আপনি এখন আসুন ম্যাডাম। ধোয়া-মোছা শেষ। গাড়ি এখন গ্যারেজে নিয়ে যাবো। আপনি এবার আসুন–

বলতে-বলতে গাড়িতে চড়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো জামালউদ্দিন প্রিন্স্।

বাসায় এসে জামালউদ্দীন প্রিন্স্ হাতেম আলীকে বললো– হাতেম আলী, তোমাদের এই আলো ম্যাডাম তো একজন মস্ত বড় মানুষ।

হাতেম আলী বললো– সে তো বটেই ভাইজান। উনি একজন মস্তবড় ধনী লোকের মেয়ে।

www.boighar.com

ঃ শুধু ঐ টুকুই নয়। এছাড়াও উনি একজন–

ঃ চোখ ধাধাঁনো সুন্দরী মেয়ে। আপনার সাথে পাল্লা দেয়া রূপ তাঁর।

ঃ আরে দূর! উনার লেখাপড়া কতখানি, তা জানো?

ঃ তা মানে, সেটা সঠিক জানিনে। তবে উনাকে আমি চিনি আর চিনি কোথায় কোথায় যেন শিক্ষকতা করেন, সেটা শুনেছি। অনেকেই উনাকে আলো ম্যাডাম বলে ডাকে, আমিও আলো ম্যাডাম বলি।

ঃ উনি একজন মস্তবড় পণ্ডিত মানুষ। একজন নাম করা বিদুষী মেয়ে।

ঃ তাই নাকি? সেটা আপনি কার কাছে শুনলেন ভাইজান?

ঃ তোমার ঐ আলো ম্যাডামের এক বান্ধবীর কাছে। দুলারী না, কি যেন নাম, সেই মেয়ের কাছে।

ঃ ও দুলারী বেগম দোলা?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ – ঐ মেয়ের কাছে।

ঃ তা কি শুনলেন? কতখানি উনার লেখাপড়া, ভাইজান?

ঃ অনেকখানি– অনেকখানি। এমন বিদুষী মেয়ের সংখ্যা এদেশে অতি অল্প।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ উনি আগে কিছুদিন প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। তারপর গিয়ে হাইমাদ্রাসায় ভর্তি হন আর খ্যাতির সাথে হাইমাদ্রাসা পাশ করেন। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার যে, হাইমাদ্রাসা পাশ করা মেয়ে ইংরেজি সাবজেক্ট্ নিয়ে ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হন, আর ইংরেজিতে কৃতিত্বের সাথে অনার্স আর এম. এ. পাশ করেন।

ঃ কি বললেন– কি বললেন? উনি ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাশ?

ঃ কৃতিত্বের সাথে পাশ আর একটি মহিলা কলেজের উনি ইংরেজির শিক্ষক।

বাচ্চাদের একটা মাদ্রাসাতেও উনি শিক্ষকতা করেন।

ঃ সোবহান আল্লাহ! আপনার একদম উপযুক্ত জুটি ভাইজান!

সচকিত হয়ে উঠে মিঃ প্রিন্স বললো– কি বললে?

হরষিত চিত্তে হাতেম আলী বললো– না বলছি,

আপনার সাথে একদম মিলে গেছে ভাইজান। জুটি বাঁধলে আপনার এই মেয়ের সাথেই জুটি বাঁধা উচিত।

ঃ খোয়াব দেখছো?

ঃ খোয়াব দেখবো কেন? সজ্ঞানেই তো দেখতে পাচ্ছি, একদম খাপে খাপ্ মিলে গেছে। উনিও নাম করা বিদ্বান মেয়ে, আপনিও বিশ্বখ্যাত বিদ্বান্ ছেলে। উনিও চোখ ধাঁধাঁনো, রূপবতী মেয়ে, আপনিও যারপরনেই দর্শনধারী ছেলে। আপনিও যেমন ঈমানদার আর পরহেজগার, উনিও তেমনই ঈমানদার আর পরহেজগার মেয়ে। রীতিমতো আব্রুপর্দা করে উনি সব সময় চলে। আপনার শাদি এমন মেয়ের সাথেই হওয়া উচিত।

ঃ হাতেম আলী!

ঃ আপনি যাকে খুঁজে নেওয়ার জন্যে পথে নেমেছেন, মানে ঐ যে যাত্রাপালার ডায়ালগ্–"চল্‌রে আনন্দ মহানন্দে ছুটে চল্, খুঁজে নিবি তোর চিরানন্দময়ে"– সেই চিরানন্দময়কে মোটেই অধিক খুঁজতে হলো না আপনার প্রথম ধাপেই তো দেখ্‌ছি, পা আপনার একদম আসল জায়গায় এসে পড়েছে।

ঃ তবেরে–

ঃ তা তাড়াই করেন আর চড় থাপ্পড়ই মারেন, খুঁজে দেখুন তো, এমন চিন্তাই কি উঁকি দিচ্ছেনা দীলে আপনার?

এমন চিন্তাই কি উকি দিচ্ছিলো প্রিন্সের দিলেও। কিন্তু সে ভাব গোপন করে প্রিন্স বললো– ওহ্‌হো! তুমি তো বেজায় বাচাল হয়ে গেছো দেখছি! যাও যাও, খাওয়ার ব্যবস্থা দেখো। দুপুর গড়িয়ে গেছে। খেতে হবে না?

মুখ ঘুরিয়ে নিলো প্রিন্স্। তা দেখে চাপা হাসি হাসতে হাসতে হাতেম আলী রওনা হলো খাবার ঘরের দিকে।

বাচ্চাদের মাদ্রাসার একটু দেখ্ ভাল্ করে পরের দিনও সকাল সকাল ফিরে এলো আলেয়া বেগম আলো। গাড়ি থেকে নেমে সে জামালউদ্দীন প্রিন্স্‌কে বললো– গাড়ি গ্যারেজে তোলার পর চাবিটা উপরে পৌঁছে দিয়ে এসো, কেমন?

প্রিন্স বললো– জি আচ্ছা ম্যাডাম।

আলেয়া বেগম আলো বাড়ির ভেতর যেতেই ড্রয়ীং রুমে তার সামনে পড়লেন তার আব্বা জহির উদ্দীন চৌধুরী। সেখানে আলোর ভাই নজীর উদ্দীন চৌধুরীর সাথে আলোর পিতা কি যেন কথাবার্তা বলছিলেন। আলোকে দেখেই জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বললেন– এই যে মা আলো, বাইরে থেকে এলে?

জবাবে আলো বললো– জি আব্বাজান এই একটু মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম।

ঃ ভালো। তা তুমি নাকি একজন নতুন ড্রাইভার নিয়োগ করেছো?

ঃ জি আব্বাজান– জি-জি।

ঃ এবার আবার কোন্ জঞ্জাল আনলে? বুড়ো-হাব্‌ড়া আর গাঁজা-ভাং-টানা যক্ষারুগী টুগি নাকি?

ঃ না-না আব্বাজান! কি যে বলেন! ঐসব আবর্জনার পেছনে আমি গাড়িতে বসবো নাকি?

ঃ কিন্তু কৈ, তাকে তো দেখলাম না?

ঃ এইসবে কয়দিন হলো তাকে নিয়োগ করেছি আব্বাজান। তাই সে চোখে পড়ে নি আপনার। এই এখনই সে গাড়ির চাবি দিতে আসবে এখানে।

ঃ আসবে?

ঃ এতক্ষণ তো আসার কথা!

বলেই সে তার ভাই নজীর উদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললো– দ্যাখ্ তোরে নজীর, ড্রাইভারটা এতক্ষণ আসছে না কেন?

নজীর উদ্দীন বললো– কে আপা, আপনার নতুন ড্রাইভার ঐ মিঃ প্রিন্স্?

আলেয়া বেগম বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ প্রিন্স্।

জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব কথা ধরে বললেন– প্রিন্স্ মানে?

আলেয়া ঈষৎ হেসে বললো– আমার এই নতুন ড্রাইভারের নাম প্রিন্স্ আব্বজান, মিঃ প্রিন্স্।

চৌধুরী সাহেব শ্লেষভরে বললেন– যাঃ-ব্বাবা! এযে দেখছি অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন!

এই সময় মিঃ প্রিন্স্ এসে সেখানে হাজির হলো এবং বললো– এই যে ম্যাডাম, গাড়ির চাবি।

আলেয়া বেগম বললো– এসো-এসো, এখানে এসো–

মিঃ প্রিন্স সেখানে গেলো। হাত পেতে চাবি নিতে নিতে আলেয়া বেগম তার পিতার প্রতি ইংগিত করে প্রিন্সকে বললো– মিঃ প্রিন্স্, এই যে ইনি আমার আব্বা।

শুনেই মিঃ প্রিন্স্ তাজিমের সাথে "আসসালামু আলাইকুম্ ওয়া রহমতুল্লাহ্" বলে চৌধুরী সাহেবকে সালাম জানালো এবং বললো– আমার খোশ্ নসীব, হুজুরকে আজ প্রথম দেখলাম।

সালামের জবাব দিয়ে চৌধুরী সাহেব জামালউদ্দীন প্রিন্সের চেহারার দিকে অভিভূত নয়নে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর আলোকে বললেন– ইনি কে? তোমার সেই ড্রাইভার কৈ? নতুন ড্রাইভার?

আলেয়া বেগম স্মিতহাস্যে বললো– এ-ই সেই নতুন ড্রাইভার আব্বাজান।

চৌধুরী সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– হোয়াট! মজাক করছো আমার সাথে? অতুলনীয় সৌন্দর্যের এই যুবক তোমার ড্রাইভার?

ঃ জি আব্বাজান এ-ই আমার নতুন ড্রাইভার।

মিঃ প্রিন্সের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে থেকে মিঃ চৌধুরী বললেন– কি তাজ্জব-কি তাজ্জব! এমন বিরল সুন্দর নওজোয়ান তোমার ড্রাইভারী করতে আসবে কেন?

আলেয়া বেগম বললো– দুঃখজনক হলেও বলছি, জীবন ধারণ করতে হলে ড্রাইভারী কেন, এর চেয়ে অনেক ছোট কাজ করতে হয় আব্বাজান। মাটি কাটা, ইট ভাঙ্গা– কিছুই বাদ যায় না।

ঃ খামুশ্ ! কি বলছো পাগলের মতো! তার চেহারার মধ্যেই উঁকি দিচ্ছে– সে একজন মস্তবড় শিক্ষিত ছেলে।

ঃ জি না আব্বাজান, শিক্ষিত নয়, অশিক্ষিত ছেলে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য তার হয়নি।

চৌধুরী সাহেব অতঃপর মিঃ প্রিন্সকে উদ্দেশ্য করে বললেন– কি গো ছেলে, লেখাপড়া কি কিছুই জানো না?

মিঃ প্রিন্স নত মস্তকে বললো– জি না হুজুর। বলা যায়, লেখাপড়া কিছুই আমি জানি না। যৎসামান্য যা কিছু জানি, তা দিয়ে চাকুরী বাকুরী দূরের কথা, দোকানে খাতা লেখা, দলীল লেখা– এসব কাজও হয় না। কাজেই–

চৌধুরী সাহেব ব্যথিত কণ্ঠে বললেন– স্যাড্ স্যাড্। ভেরী স্যাড্।

আলেয়া বেগম বললেন– তবে চরিত্র তার ফুলের মতো পবিত্র আব্বাজান। যেমনই ঈমানদার, তেমনই পরহেজগার। অসততার একবিন্দু কালো দাগ চরিত্রে তার নেই।

চৌধুরী সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন– থাকবে না-থাকবে না। এমন আসমানী পুরুষের চরিত্রে কোনো দাগ লাগতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাকে সহি সালামতে রাখুন– এই কামনা করি। তার যেন খওয়া-পরা-থাকার কোনো অসুবিধা না হয় মা আলো। যত টাকা লাগে আমি দেবো। ভাগ্য বিড়ম্বিত এমন মানুষের অযত্ন হলে আমরা গুনাহ্গার হয়ে যাবো আম্মাজান।

আলেয়া বেগম আলো এবার প্রিন্সকে লক্ষ্য করে বললো– সাব্বাস! তুমি বড় ভাগ্যবান মিঃ প্রিন্স্। আমার আব্বার হৃদয় তুমি প্রথম দিনেই জয় করে ফেললে।

মিঃ প্রিন্স্ বললো– মহৎ মানুষের হৃদয় সব সময় মহৎই হয় ম্যাডাম। দুবৃত্ত-দুর্বাচার ছাড়া এই হুজুরের মতো মহৎ লোকেরা সাধারণ মানুষের সব সময় কল্যাণ কামনাই করে থাকেন।

হাত তুলে মিঃ প্রিন্স্কে থামিয়ে দিয়ে বললেন– ব্যাস্-ব্যাস্। আমি মোটেই কোনো মহৎ লোক নই। তবে সজ্জনেরা সবাই আমার স্নেহের পাত্র।

এরপর তিনি ফের আলোকে প্রশ্ন করলেন– তা এ ছেলেকে তুমি যোগাড় করলে কি করে আম্মাজান?

আলো বললো– ওয়ার্ক্শপের ঐ হাতেম আলীকে তো আপনি চেনেন আব্বাজান! আপনার অনেক ফাই-ফরমায়েস্ খেটে দেয় ঐ হাতেম আলীই একে যোগাড় করে দিয়েছে। ঐ হাতেম আলীর সাথেই এলোক এক ভাড়াবাড়িতে থাকে আর হাতেম আলীর সাথেই খায়।

ঃ বহুৎ আচ্ছা– বহুৎ আচ্ছা। তা তুমি সব সময়ই এদের দেখ্‌ভাল্‌ করবে আম্মাজান। এদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

ঃ জি আচ্ছা আব্বাজান, জি আচ্ছা।

ঃ সময় পেলেই আমিও কিন্তু যাবো আম্মাজান। তুমি এদের দেখ্‌ভাল্‌টা ঠিক মতো করছো কিনা, তা তদন্ত করে দেখতে যাবো যে কোনো সময়। হুঁশিয়ার–

বলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব।

৪

অপেক্ষাকৃত একটু দূরে এলাকা থেকে ফিরে আসার পথে এক পেট্রোল পাম্পের এক পাশে গাড়ি থামালো জামালউদ্দীন প্রিন্স। এরপর পেছনের সীটে উপবিষ্টা আলেয়া বেগম আলোর দিকে "আচ্ছা ম্যাডাম–" বলে তাকিয়েই সে সংবিত্‌ হারিয়ে ফেললো এবং নিমেষ খানেক তাকিয়ে থাকার পর চম্‌কে উঠে সশব্দে "সরি" বলে ফিরিয়ে নিলো মুখ।

ঘটনাঃ আলেয়া বেগম আলো তখন ঢাক্‌নাসহ গোটা বোরকাটাই মাথা থেকে নামিয়ে উদোম হয়ে বসেছিলো। গোটা মুখ-মাথা তো বটেই আলোর বুকেরও কিঞ্চিৎ অংশ উন্মুক্ত হয়েছিলো। আলোর এই অতুলনীয় সৌন্দর্যে নজর পড়ায় অনেকটা অজ্ঞাতেই অভিভূত নয়নে সে দিকে নিমেষ খানেক চেয়ে রইলো প্রিন্স্‌। এরপর হুঁশ ফিরে আসতেই সশব্দে "সরি" বলে উঠলো।

হুঁশ ফিরে এলো আলেয়া বেগম আলোরও। বোরকা তুলে মাথার উপর দিতে দিতে বললো– কি হলো প্রিন্স? ভুৎ দেখার মতো এমন চমকে উঠলে যে?

জবাবে অন্যদিকে মুখ রেখে প্রিন্স বললো– না-মানে, আমি কি জানি ম্যাডাম যে, আপনি বোরকা নামিয়ে ও রকম উদোম্‌ হয়ে বসে আছেন!

ঃ থাকবো না? যে গরমের গরম! গা-মাথা একদম ঘেমে গেছে।

ঃ কিন্তু তাতে তো আমি গুনাহগার হলাম।

ঃ তুমি গুনাহগার হলে?

ঃ হলাম না? তাকিয়েই আমি আপনাকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। অনেকটা অজ্ঞাতেই পলক খানেক আমি চেয়ে রইলাম আপনার দিকে। যা দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, আপনার সেই সৌন্দর্য আপনি খোলা, রাখবেন কেন?

ঃ ওরে বাপরে! তোমাকে নিয়ে তো বড় মুস্কিল হলে দেখছি। গরমে জান বাঁচেনা আমার আর একজন আমার মুখ দেখলেই তুমি গুনাহগার হয়ে যাবে ভেবে আমি ছালা-কম্বল জড়িয়ে মুখ ঢেকে থাকবো?

ঃ ম্যাডাম!

ঃ ওতে কিছু হবে না। গুনাহ্‌গার হওয়ার এতে কিছু নেই। একসাথে সব সময় চলাফেরা করবো আর তুমি আমার মুখ মন্ডল একবারও দেখতে পাবে না, এটা কি হয়? ওসব সুঁচিবাঈ ত্যাগ করো।

ঃ কিন্তু–

ঃ কিন্তুর কিছু নেই। কি বলছিলে, বলো?

ঃ পেট্রোল নিতে হবে। কতখানি নেবো?

ঃ তিন চার লিটার নাও। তার বেশী তো লাগার কথা নয়।

ঃ জি-জি। তাহলে তিন লিটারই নিই।

www.boighar.com

ঃ তাই নাও।

প্রিন্স গাড়ি থেকে নেমে গেলো। আলেয়া বেগম আবার মুখ-মাথা থেকে নামিয়ে ফেললো বোরকা।

জায়গাটা পেট্রোল পাম্প। সৎ অসৎ কয়েক শ'লোকের ভিড় সেখানে। গাড়ির জানালার কাঁচ নামানো থাকায়, সে দিকে তাকিয়ে কয়েকজন খন্নাস মার্কা যুবক না-না কথা বলতে লাগলো। একজন বললো– এই দ্যাখ্-দ্যাখ্, একদম টাট্‌কা ছানা। ইশ্! এমন ছানা বেড়ালে খাবে রে!

দ্বিতীয় জন বললো– তো কি করছি?

প্রথমজন বললো– বেড়ালে খাবে আর আমরা বসে আঙ্গুল চুষ্‌বো? কভ্‌ভি নেহি। একদম লাওয়ারিশ মাল। গাড়িতে কেউ নেই। চল্ পাত্তা লাগাই–

দ্বিতীয়জন বললো– লা-ওয়ারিশ নয়, লা-ওয়ারিশ্ নয়। ঐ দ্যাখ্, আমাদের দিকে কেমন চোখ করে তাকাচ্ছে।

ঃ এ্যাঁ! তাইতো রে! কে ওটা?

ঃ ড্রাইভার। ও-ই তো গাড়ি থেকে নেমে এলো।

ঃ যা-ব্বাবা! এটাও তো আর এক খাশা মাল।

ঃ তো আর বলছি কি? এবার বুঝে দ্যাখ্, বিড়ালে নয়, খাশা মালেই খাশা ছানা খাচ্ছে।

ঃ তা তো মনে হচ্ছে।

ঃ বেছে বেছে ড্রাইভারও রেখেছে একদম যুৎসই।

ঃ হোক যুৎসই। শালা চান্স্ একটা নেবোই। এই তোরা আয়তো দেখি–

প্রথম জন অন্য কয়েকজন সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে গাড়ির জানালার কাছে দৌড়ে এলো। এদের কথাবার্তা মিঃ প্রিন্স সবই শুনতে পেলো। কিন্তু পাম্পের চারপাশে নানাজনের গোলমালের কারণে একটা কথাও আলোর কানে পড়লো না। প্রিন্সের পেট্রোল নেয়া শেষ হয়ে গিয়েছিলো। দুবৃত্তেরা এসে খোলা জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে আলো বেগম "এই কে তোমরা? কে তোমরা? বলে

ভীতকণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে উঠলো। এই সময় প্রিন্স এসে দ্রুত গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো– জানালা বন্ধ করে দিন ম্যাডাম, বন্ধ করে দিন–

– বলেই ক্ষিপ্র হস্তে গাড়ি ষ্টার্ট দিল প্রিন্স্। পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়ি সরে এলে আলেয়া বেগম বললো– ঘটনা কি মিঃ প্রিন্স? ওরা কি খারাপ লোক?

প্রিন্স্ বললো– এখনও বুঝতে পারেননি ম্যাডাম? ওরা জাত শয়তান। খন্নাস লোক।

ঃ তাই তুমি দ্রুত গাড়িতে ছুটে এলে?

ঃ না, আগে গাড়িতে আসতাম না। কিন্তু আমার হাত একদম খালি। একটা লাঠি হাতে থাকলেও, আগে ঐ শয়তানদের দুরমুশ্ করে দিয়ে তবে এসে গাড়িতে উঠতাম।

ঃ তাই?

ঃ অবশ্যই। শয়তানদের এতবড় সাহস! দিনে দুপুরে গাড়িতে হামলা!

ঃ প্রিন্স্।

ঃ এবার বুঝতে পারছি, কোথাও বেরুতে হলে লাঠি একখানা থাকতেই হবে সাথে। খালি হাতে বাইরে বেরোনো যাবে না।

ঃ লাঠি হাতে থাকলেই তুমি দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে পারবে?

ঃ প্রাথমিক ধাক্কাটা তো সামাল দিতে পারবো। আপনাকেও আবার বলি ম্যাডাম, পথেঘাটে এভাবে বেআব্রু হবেন না। গা-মাথা-মুখ এভাবে খুলে রাখবেন না। গুনাহর ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি যে মুখ দেখলে বেখেয়াল হয়ে যাই, খন্নাসেরা সে মুখ দেখলে চুপ্ থাকতে পারে না। আপনি বেআব্রু হয়েছিলেন আর ওখানকার গুণ্ডা বদমায়েসরা আপনাকে দেখামাত্র উতলা হয়ে উঠে ছিলো আর নানা মন্তব্য করছিলো। শেষ পর্যন্ত নিজেদের সামলাতে না পেরে ঐ তো দেখলেন, গাড়ির উপর কেমন হামলা করেছিলো।

ঃ ও মাগো! কি বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম আজ! আর এমনটি হবেনা।

ঃ খেয়াল থাকে যেন ম্যাডাম। সৎ অসৎ যে-ই হোক, সুন্দর জিনিস চোখে পড়লে তারা সে দিকে তাকাবেই।

ঃ তাই-তাই। এবার বুঝতে পারছি।

কথা বলতে বলতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে ফিরে এলো তারা।

গাড়ি গ্যারেজে রেখে জামালউদ্দীন প্রিন্স্ বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করলো এবং বিকেলে ফের আলেয়া বেগমদের বাড়িতে এলো আলো ম্যাডাম আর কোথাও যাবে কিনা তা জানার জন্যে। ড্রইং রুমের কাছে আসতেই সে শুনতে পেলো আলেয়া বেগম আলো অবিরাম ডাকছে– আসকান–আবেদ–মনতাজ আলী –

জামালউদ্দীন প্রিন্স কাছে এগিয়ে এসে বললো– কি কাজ ম্যাডাম? এদের এত ডাকছেন যে?

প্রিন্সকে দেখেই আলো ম্যাডাম বললো– এই যে, মিঃ প্রিন্স এসেছো? বেশ ভালোই হলো। তুমি আমার কাজটা করো তো। আব্বা সে সবগুলোকে কোন্ চূলোয় পাঠিয়েছেন– তা তিনিই জানেন। আমি ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলাম, তবু কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। তুমি কাজটা করোতো?

ঃ কি কাজ ম্যাডাম?

ঃ মুচির দোকানে যেতে হবে। স্যান্ডেল জুতা ঠিক করে আনতে হবে।

ঃ স্যান্ডেল জুতা?

ঃ হ্যাঁ। হাতের কাছে লোক নেই, অথচ সন্ধ্যার সময়ই আমার দরকার। তুমি পারবে না?

ঃ তা আপনি বললে আর না পারার কি আছে? দিন সেগুলো।

ঃ তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আনি–

আলো বেগম বাড়ির মধ্যে গেলো এবং ব্যাগভর্তি জুতা-স্যান্ডেল এনে মেঝেতে ঢেলে ফেলে বললো– এগুলো ঠিক করতে হবে।

সবগুলোই মেয়েছেলের অর্থাৎ আলেয়া বেগম আলোর জুতা স্যান্ডেল। প্রিন্স বললো– এর কোনোটার কি করতে হবে ম্যাডাম?

আলেয়া বেগম বললো– এই যে, এটা আমার বাইরে যাওয়ার স্যান্ডেল। এর ফিতা ছিঁড়ে গেছে। ফিতা লাগিয়ে আনবে। এটা আমার কলেজে যাওয়ার জুতা। ময়লা-মাটি লেগে বিশ্রী হয়ে গেছে। এটা সাফ করে কালি করতে বলবে। আর এই যে বাড়িতে পরা দুইতিন জোড়া স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। এই দুইজোড়া বাড়ির কাজের মেয়েরা পরে। এগুলোর ফিতেও ছিঁড়ে গেছে। সবগুলোতেই নতুন ফিতে লাগিয়ে আনবে।

ঃ জি আচ্ছা ম্যাডাম।

ঃ রাস্তাঘাটের ফাল্তু মুচির কাছে যাবে না। একদম মেন্ রোডে বসা এক্সপার্ট মুচির কাছে যাবে। বুঝেছো?

ঃ জি ম্যাডাম, জি।

ঃ তো যাও, কাজটা তাড়াতাড়ি করে, নিয়ে এসো।

ব্যাগ হাতে নিয়ে চলে গেলো প্রিন্স। কাজটা সেরে নিয়ে যখন সে ফিরে এলো, তখন বেলা অনেকখানি পড়ে গেছে। বাপ্বেটি দুইজন তখন ড্রইংরুমে কথাবার্তা বলছিলেন। এই সময় প্রিন্স ফিরে এলে, বাপ জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বললেন– আরে কে? মিঃ প্রিন্স না?

বেটি আলেয়া বেগম বললো– কি আব্বাজান, ওকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলাম।

ঃ কাজে? তা মিঃ প্রিন্স, হাতে ব্যাগ্ দেখছি, ব্যাগে করে কোথা থেকে কি নিয়ে এলে?

মিঃ প্রিন্সকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন চৌধুরী সাহেব। জনাবে প্রিন্স্ বললো– বাজার থেকে হুজুর। মুচির দোকান থেকে জুতা স্যাণ্ডেল সারিয়ে আনলাম।

তড়াক্ করে মাথা তুলে চৌধুরী সাহেব বললেন– জুতা– স্যাণ্ডেল মানে? কার জুতা স্যান্ডেল?

আলেয়া বেগম বললো– আমার আব্বাজান। বাড়ির কাজের মেয়েদেরও কয়েক জোড়া স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল ওর ঐ ব্যাগের মধ্যে আছে।

বিপুল বিস্ময়ে চৌধুরী সাহেব বললেন– আর তুমি এই মিঃ প্রিন্সকে দিয়ে সেগুলো সারিয়ে আনলে?

ঃ জি আব্বাজান। চাকর বাকরদের কাউকেই ডেকে পেলাম না তো–

ঃ তাই এই ছেলেকে দিয়ে তাদের কাজটা করিয়ে নিলে?

ঃ জি-জি।

ঃ খামুশ। তোমার জ্ঞান গম্মি কবে হবে বলোতো আলো? ভাগ্যের মারপ্যাঁচে দুর্দিনে পড়েছে বলে এই রকম সুদর্শন, পরিচ্ছন্ন আর ঈমানদার ছেলের দ্বারা ওদের কাজটা করিয়ে নিলে? বিবেকের দংশন তোমার থাক বা না থাক, গুনাহর ভয়ও কি তোমার নেই?

থতোমতো খেয়ে আলেয়া বেগম বললো– এ্যাঁ। আমি কি তাহলে ভুল করেছি আব্বাজান?

চৌধুরী সাহেব রুষ্ট কণ্ঠে বললেন– সেটা বোঝার বয়স তোমার কবে হবে? শুধু খানিকটা লেখাপড়া জানলে তুমি পাত্তা পেতে না যার কাছে, তাকে তুমি লাগিয়ে দিয়েছো কামিন-ময্দুরের কাজে। তোমার গাড়ি চালায়, সেইটেই যথেষ্ট। তার চেয়েও ছোট কাজে লাগাকে বিবেকে তোমার বাধলো না?

ঃ আব্বাজান!

ঃ কি বলবো! শুধু লেখাপড়াটাই নেই। নইলে, রূপ, গুণ, আদব, আক্কেল, ঈমান– সবকিছুই যার মধ্যে হাজারটা ভদ্দর লোকের চেয়ে শতগুণে অধিক পরিমাণে আছে, তাকে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নেয়াটাও বিবেক সম্মত নয়। তাকে কিনা–

কথা আট্কে গেলো চৌধুরী সাহেবের গলায়। ক্ষোভে তিনি মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগলেন। আলেয়া বেগম বললো– আমাকে মাফ করে দিন আব্বাজান। আমার ভুল হয়ে গেছে।

চৌধুরী সাহেব প্রত্যয়ের সাথে বললেন– একটু বেশী পরিমাণে লেখাপড়া জানতো যদি, তাহলে তোমার চেয়েও অনেক বড় ঘরের আর বেশী সুন্দরী মেয়ে একটু পাত্তা পাওয়ার জন্যে ওর পিছে পিছে চরকীর মতো ঘুরতো, বুঝলে?

মিঃ প্রিন্স এতক্ষণ তৃপ্তির সাথে চৌধুরী-সাহেবের কথাগুলো শুনছিলো। আর নীরব থাকা চলে না দেখে সে বলে উঠলো– না হুজুর, না-না, আমি কিছু মনে করিনি। ম্যাডামের কোনো কসুর নেবেন না।

চৌধুরী সাহেব বললেন– আমি জানি, তুমি এমন কথাই বলবে। তোমার মতো ছেলে কোনোদিন অপরকে বেকায়দায় পড়তে দেবে না। তুমি থামো।

অতঃপর আলেয়া বেগমকে বললেন– আলেয়া তুমি শুনো। গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছো, নাও। এমন চরিত্রবান ছেলেই তোমার এ কাজে দরকার। কিন্তু খবরদার! কোনো রকম অসম্মান বা অভদ্র আচরণ এর সাথে কখনো করবে না। এটা আমার সাফ কথা। করলে আমি কোনোদিনই ক্ষমা করবো না তোমাকে। হুঁশিয়ার– রুষ্টভাবেই সেখানে থেকে চলে গেলেন চৌধুরী সাহেব।

কয়েকদিন পরে পেট্রোল পাম্পের ওদিকে আবার একটু কাজের জন্যে গাড়ি নিয়ে বের হলো আলেয়া বেগম আলো। জামালউদ্দীন প্রিন্স আর ভুল করেনি। কোথাও যেতে হলেই সে তখন সাথে রাখে পাকা বাঁশের গিট্ওয়ালা শক্ত একটা লাঠি এবারও তাই রেখেছিলো।

কিন্তু ওদের গতি বিধির উপর সেবারের ঐ খন্নাস কয়জনের নজর সেই থেকেই ছিলো। এরা এদিকেই আসছে বুঝতে পেরে খন্নাসেরা অতিদ্রুত এসে রাস্তার অত্যন্ত সংকীর্ণ জায়গায় গাছের গুড়ি টেনে এনে রাস্তা বন্ধ করে দিলো এবং চুপ্ করে গা ঢাঁকা দিয়ে রইলো।

গাড়ি এসে রাস্তা বন্ধ দেখে থেমে যেতেই হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালো খন্নাসেরা। সংখ্যায় এরা পাঁচজন। আলেয়া বেগম ও প্রিন্স কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা ধাক্কা মেরে খুলে ফেললো গাড়ির গেট্ এবং আলেয়া বেগম আলোকে ধরে গাড়ি থেকে টেনে নামালো আর ট্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যেতে লাগলো। এবার এদের সাথে ছিলো বন্দুক। আলেয়া বেগম ভয়ে "বাঁচাও-বাঁচাও" বলে চীৎকার শুরু করলে, লাঠি পিঠের পেছনে রেখে লাভ দিয়ে নেমে এলো প্রিন্স এবং বন্দুক হাতে দন্ডায়মান খন্নাসদের দলপতিকে বললো– এই– এই, তোমরা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

সংগে সংগে প্রিন্সের দিকে বন্দুক তাক করে দলপতি বললো– জাহান্নামে! শালা, গতবার আমাদের হাত খালি ছিলো বলে খুব বাহাদুরী করে পালিয়ে গিয়েছিলে এবার তোর কোনো বাপে তোকে বাঁচায়রে শালা?

প্রিন্স্কে দেখে আলেয়া বেগম চীৎকার করে বলে উঠলো– প্রিন্স, বাঁচাও-আমাকে বাঁচাও–

প্রিন্স্ কায়দা করে বললো– হাতে শক্ত করে কামড় মারো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওর হাতে – ওর হাতে–

এ কথায় দলপতি ওদিকে তাকাতেই প্রিন্স লাঠি বের করে এমন জোরে এক বাড়ি মারলো দলপতির হাতে যে, তার এক হাত থেতে হয়ে গেলো এবং তার হাতথেকে বন্দুক ছিটকে নীচে পড়ে গেলো। আহত হাত নিয়ে দলপতি বন্দুকের দিকে এগুতেই মিঃ প্রিন্স ক্ষিপ্রহস্তে তুলে নিলো বন্দুক এবং খটাশ্ করে বন্দুক ভেঙ্গে দেখলো, দো-নালা বন্দুকটিতে দুটো কার্টিজ্ই ভরা আছে। সংগে সংগে আবার খট্ করে বন্দুক সোজা কর প্রিন্স্ হাত দিলো ট্রিগারে এবং দলপতির দিকে বন্দুক ধরে বললো– পালা শয়তান, বাঁচতে চাস্ তো পালা। নইলে এখনই তোর বুক ঝাঁঝরা করে দেবো।

হতবুদ্ধি দলপতি চমকে উঠে বললো– ওরে বাপ্রে। হঠাৎ একি হলো!

মিঃ প্রিন্স্ ধমক দিয়ে বললো– খামুশ্ শয়তান। ম্যাডামকে এখনই ছেড়ে দিতে বল্, নইলে ছুটলো গুলি–

চমকে উঠে দলপতি তার সঙ্গীদের বললো– এই– এই, ওকে ছেড়ে দিয়ে পালা তোরা, শিগগির পালা। নইলে আমি এখনই মারা পড়বো।

খন্নাসদের বদনসীব। নিকটেই থানা। কেনা কে ইতিমধ্যেই থানাতে খবর দিয়েছিলো। সংগে সংগে গাড়ি ভর্তি পুলিশ নিয়ে থানার ও.সি. এসে হাজির হলেন সেখানে। আলেয়া বেগমকে ছেড়ে দিয়ে খন্নাসেরা ঘুরে দাঁড়িয়ে পুলিশ দেখেই, "ওরে বাবারে! পুলিশ-পুলিশ!" বলে দৌড়ে এদিকে আসতেই মিঃ প্রিন্স বললো– আয় ব্যাটারা, মর তাহলে–

বলেই বন্দুকের ফাঁকা একটা আওয়াজ করলো প্রিন্স্। চমকে উঠে এরা দলপতি সহ একে অপরকে ধরে জড়াজড়ি করতেই পুলিশেরা এসে সব ক'টার হাতে হ্যাণ্ডকাপ্ পরালো।

খন্নাস, অর্থাৎ দুর্বৃত্তদের টেনে নিয়ে পুলিশেরা কয়েকজন গাড়ির দিকে রওনা হলো। এবার ও.সি. সাহেব মিঃ প্রিন্সকে বললেন– আপনাকে ধন্যবাদ দিই যে, আপনি কায়দা করে বন্দুকটা হাত করতে পেরেছিলেন। নইলে শয়তানটা হয়তো গুলি করেই বসতো আপনাকে।

মিঃ প্রিন্স্ বললো– আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আপনারা এ সময় এসে পড়েছিলেন। নইলে বদমায়েশেরা পালিয়েই যেতো। ধরা পড়তো না।

ও.সি. সাহেব বললেন– তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি? আপনি কে?

মিঃ প্রিন্স্ বললো– আমি এই গাড়ির ড্রাইভার।

ও.সি. সাহেব বিপুল বিস্ময়ে বললেন– হোয়াট!

এমন সুদর্শন চেহারা আপনার আর আপনি ড্রাইভার?

ও.সি.-র পাশে থাকা পুলিশটা বললো– বন্দুকের হাতও খুব চমৎকার স্যার। একজন ড্রাইভার কি এমনভাবে বন্দুক চালাতে পারে? নিশ্চয়ই উনি সত্যি গোপন করছেন।

ও.সি. সাহেব বললেন– ঠিক তাই।

অতঃপর প্রিন্সকে বললেন আপনি সত্যি কথা বলুন?

আলেয়া বেগম আলো ইতিমধ্যেই বোরকার ঢাক্না নামিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছিলো। এবার সে বললো–

জিনা জনাব, উনি সত্যি কথাই বলছেন। উনি আমাদের ড্রাইভার।

ঃ আপনাদের ড্রাইভার। আপনি কে? নাম কি আপনার?

ঃ আমার নাম আলেয়া বেগম আলো।

ঃ আলেয়া বেগম আলো?

ও.সি. সাহেব ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। বললেন আচ্ছা, আপনি কি আলো ম্যাডাম?

আলেয়া বেগম বললো– জি-জি। আমি জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেবের মেয়ে আলেয়া বেগম আলো। মানে, আলো ম্যাডাম!

ঃ সোবহান আল্লাহ! জনাব চৌধুরী সাহেবের মেয়ে আপনি? মানে, এ এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জনাব জহির উদ্দীন চৌধুরী আপনার আব্বা?

ঃ জি-জি!

ঃ কি তাজ্জব! আপনাদের উপর হামলা করলো, এই ব্যাটা দাগী আসামীরা? ব্যাটাদের আমরা দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর আজ–

ঃ এদের যেন উপযুক্ত সাজা হয় ও.সি. সাহেব।

ঃ হবে মানে কি! এরা খুন-ধর্ষণ সহ বহু কেসের আসামী। কঠিন সাজা হবে এদের। তা আপনারা এখন কোথায় যাবেন?

ঃ না, বাধা পড়লো যখন, এই সব ঝুটঝামেলার পর আর কোথাও যাবো না। প্রয়োজনও খুব জরুরি নয়।

ঃ তাহলে বাসাতেই ফিরে যান ম্যাডাম। ব্যাটাদের লক্আপে পুরেই আমি চৌধুরী স্যারের সাথে দেখা করতে আসছি।

ঃ জি। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ঐ বন্দুকটা?

ঃ ও হ্যাঁ, ওটা আমি নিয়ে যাই। মামলার আলামত হিসাবে ওটা লাগবে।

বন্দুক ও আসামীদের নিয়ে ও.সি. সাহেব থানায় ফিরে গেলেন। আলেয়া বেগমও অতঃপর ফিরে এলো বাড়িতে। বাড়িতে এসে আলেয়া বেগম গাড়ি থেকে নেমে এলো আর মিঃ প্রিন্স্ গাড়ি ফের গ্যারেজে রাখতে গল।

আলেয়া বেগম বাড়ির ভেতরে যেতেই তার আব্বা চৌধুরী সাহেবের সাথে তা দেখা। চৌধুরী সাহেব ড্রইংরুমে ঢুকছিলেন।

আলেয়াকে দেখেই তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন–

কি ব্যাপার! তুমি এখনই ফিরে এলে যে?

আলেয়া বেগম আবেগভরে বললো– আমরা দুর্বৃত্তের হাতে পড়েছিলাম আব্বাজান! বন্দুকধারী দুবৃত্তের হাতে। নিতান্তই নসীবের জোরে বেঁচে গেছি আমরা।

চৌধুরী সাহেব চমকে উঠে বললেন– সে কি– সেকি!

এসোতো, বসোতো শুনি। কি মুসিবত– কি মুসিবত–

বলতে বলতে চৌধুরী সাহেব আলেয়া বেগমকে ডেকে নিয়ে এসে ড্রইংরুমে বসলেন এবং তারপর প্রশ্ন করলেন– কোথায়, কোথায় তোমরা এমন বিপদে পড়লে?

আলেয়া বেগম বললো– একটা নির্জন জায়গায় আব্বাজান। ঐ পূব দিকে যেতে যে একটা পেট্রোল পাম্প আছে, সেই পাম্পের খানিকটা এই পশ্চিম দিকে। সেখানে রাস্তাটা সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। ঐ জায়গায় গাছের গুড়ি টেনে এনে রাস্তাটা ব্লক্ করে দিয়েছিলো দুর্বৃত্তেরা। ওরা নাকি মার্কামারা দাগী আসামী।

ঃ সে কি! সেটা কি করে জানলে?

ঃ ও.সি. সাহেব বললেন। থানাটা নিকটেই তো! সংবাদ পেয়ে ও.সি. সাহেব এসেছিলেন।

ঃ ও, ওখানে ঐ থানার কাছে ঘটনা? ও.সি. মারুফ মোল্লা এসেছিলো?

ঃ জি-জি। তাই হবে। আপনার প্রতি উনাকে খুব শ্রদ্ধাশীল দেখলাম।

ঃ আচ্ছা। তা কিভাবে কি ঘটলো?

ঃ সামনে গাছের গুড়ি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করা দেখে গাড়ি থামাতেই ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা পাঁচ-পাঁচজন দাগী আসামী হুংকার দিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো গাড়ির উপর।

ঃ তারপর?

ঃ আমরা কিছু বুঝে উঠার আগেই ওরা ধাক্কা মেরে গাড়ির দরজা খুলে ফেললো এবং আমাকে টেনে গাড়ি থেকে নামালো।

ঃ তারপর-তারপর?

ঃ তিন-চারজন দুর্বৃত্ত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতেই আমার ড্রাইভার মিঃ প্রিন্স্ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলো আর দুর্বৃত্তদের দলপতিকে প্রশ্ন করতেই প্রিন্সের বুক বরাবর বন্দুক বাগিয়ে ধরলো দলপতি।

ঃ কি সর্বনাশ! তারপর?

www.boighar.com

মিঃ প্রিন্স কায়দা করে ঐ দলপতির দৃষ্টি আমার দিকে ঘুরিয়ে দিলো। দলপতি আমার দিকে তাকাতেই প্রিন্সের হতে থাকা শক্ত একটা লাঠি দিয়ে দলপতির হাতে এমন জোরে একটা বাড়ি মারলো যে, দলপতির এক হাত

বইঘর.কম ও রোকন

একদম থেঁত্‌লে গেলো আর তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলো।

ঃ এ্যাঁ। তারপর।

ঃ তারপরই বিস্ময়ের পালা আব্বাজান! বিপুল বিস্ময়।

ঃ কি রকম– কি রকম?

ঃ এই মিঃ প্রিন্স লোকটা আসলে কে? আর্মির লোক না পুলিশ ভেবে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। বন্দুক মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মিঃ প্রিন্স ওটা তৎক্ষণাৎ তুলে নিলো। এরপর এমন অবহেলে খটাশ্‌ করে বন্দুক ভেংগে দেখে আবার খট্‌ করে বন্দুক সোজা করলো আর ট্রিগারে হাত দিয়ে বন্দুক দুর্বৃত্তদের দলপতির বুক বরাবর ধরলে যে, দলপতি চম্‌কে উঠে "মারা গেলাম– মারা গেলাম" বলে চীৎকার শুরু করলো।

ঃ সোবহান আল্লাহ! তারপর?

ঃ দলপতির নির্দেশে তার সঙ্গীরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পুলিশ এসে ঘিরে ফেললো তাদের। তা দেখে দুর্বৃত্তেরা আমাদের পাশ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই মিঃ প্রিন্স বন্দুকের এক ফাঁকা আওয়াজ করে থামিয়ে দিলো তাদের আর তখনই পুলিশ এসে হ্যাণ্ডকাপ পড়ালো ওদের সবার হাতে। আর কেউ পালাতে পারলো না।

ঃ আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ! এই ঘটনা?

ঃ জি আব্বাজান, এই বিস্ময়কর ঘটনা।

ঃ মিঃ প্রিন্স এখন কোথায়?

ঃ ও.সি. সাহেবের পরামর্শে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে প্রিন্স। সে এখন গাড়ি গ্যারেজে তুলছে।

ঃ সাব্বাস! জোর সাব্বাসী দিই মিঃ প্রিন্সকে।

ঃ আপনি সাবাসী দিচ্ছেন, কিন্তু ভেজে মাথা আমার বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে। কে এই মিষ্টার প্রিন্স? এমন সুদর্শন চেহারা, ফুলের মতো এমন পবিত্র চরিত্র, বিভিন্ন দিকে এমন অতুলনীয় দক্ষতা, কথাবার্তার মান এত উন্নত আর ভাষা এমন প্রাঞ্জল– এ লোক হেসে খেলে গাড়ির ড্রাইভারী করছে, কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করছে না, এর অর্থ কি? এ লোক তো আদৌ সাধারণ লোক নয়!

ঠিক এই সময়ই সেখানে এসে হাজির হলেন থানার ও.সি. মারুফ মোল্লা। তাকে দেখেই চৌধুরী সাহেব বললেন– আরে মোল্লাজী, আসুন– আসুন, এখানে আসুন–

ও.সি. মারুফ মোল্লা ড্রইংরুমে ঢুকলে আলেয়া বেগম ক্ষিপ্র হস্তে বোরকার ঢাকনা নামিয়ে দিলো। চৌধুরী সাহেব ও.সি.কে বললেন– বসুন– বসুন, ঐ চেয়ারে বসুন।

বসতে বসতে ও.সি. মারুফ মোল্লা বিনীত কণ্ঠে বললেন– দোহাই স্যার, "আপনি" বলে আমাকে শরমিন্দা আর গুনাহ্গার করবেন না। আপনার কাছে আমি আকণ্ঠ ঋণী। আপনার অর্থ সাহায্য না পেলে আমার লেখাপড়া প্রাইমারীর উপরে উঠতো না আর আজ এই ও.সি. হতেও পারতাম না। বি.এ. ক্লাশ পর্যন্ত আপনার লাগাতার অর্থ সাহায্যই আমাকে আজ এই পর্যায়ে তুলেছে। আপনার আমি ছাত্র তুল্য।

ঃ সাব্বাস্! তোমার এই বিনয় বরাবরই মুগ্ধ করেছে আমাকে। তা থাক। ঘটনা কি বলোতো?

ঃ ঘটনা বলতে গেলে, আগে ধন্যবাদ দিতে হয় আলো ম্যাডামের গাড়ির ড্রাইভারকে। কি তার বুদ্ধিমত্তা আর কি তার দক্ষতা। সে কায়দা করে বন্দুক হস্ত গত না করলে, ড্রাইভার ওখানেই নিহত হতো আর ঐ দুর্বৃত্তেরা ম্যাডামকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতো। ওদের আর এ্যারেষ্ট করতে পারতাম না।

ঃ তাই?

ঃ জি স্যার। আপনাদের ঐ ড্রাইভারের বুদ্ধিতেই আমরা সময় পেলাম ঠিক মুহূর্তে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার।

ঃ সাবাস-সাবাস। তা ঐ দুবৃত্তরা কারা?

ঃ দাগী আসামী স্যার। জঘন্য দাগী-আসামী। খুন-ধর্ষণ-রাহাজানীসহ প্রচুর কেস্ আছে ওদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা, কিন্তু ধরতে পারিনি। আজকের এই ঘটনায় ধরতে ওদের সক্ষম হয়েছি। অবশ্য আমাদের একজন সোর্স্ আমাকে আগাম খবরটা দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

ঃ আচ্ছা! তা ঐ আসামীরা এখন কোথায়?

ঃ লক্-আপে তুলে রেখেছি স্যার। গিয়ে ওদের আরো খানিকটা বানাবো, তারপর আদালতে হাজির করবো।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করো। যাতে করে ওদের উপযুক্ত শাস্তি হয়। সেই ব্যবস্থা করো।

ঃ যে রকম গুরুতর ওদের অপরাধ, তাতে ওদের ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী স্যার। তা নাহলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিছুতেই আট্কাবে না। প্রচুর চাক্ষুষ প্রমাণ আর বিক্ষুব্ধ সাক্ষী আছে ওদের প্রত্যেকটি কেসের। আসামীদের প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে সবাই তারা মরিয়া। খুন আর ধর্ষণের মতো ঘটনা দুর্বৃত্তেরা প্রকাশ্য দিবালোকে আর ভিকটিম্দের আপনজনের সামনে ঘটিয়েছে।

ঃ বেশ–বেশ! আল্লাহ তায়ালা দুর্বৃত্তদের সর্বাধিক শাস্তির ব্যবস্থা করুন, এই কামনাই করি।

ঃ তা আপনাদের এই ড্রাইভারটা কে স্যার? এমন সুদর্শন চেহারা, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর এরকম দক্ষতা এক সাথে সাধারণতঃ দেখা যায় না। বুদ্ধি আর দক্ষতা পুলিশ আর্মিতে কিছু দেখা গেলেও তা অধিক লোকের মধ্যে নয়। কে এই লোক? এক সাথে এত গুণ–

ঃ সেইটেই তো দেখছি চিন্তায় ফেললো আমাদের। ক্রমে ক্রমে তার এত গুণাবলী প্রকাশ পাচ্ছে যে, আর আমরা নীরব থাকতে পারছিনে। ভালো করে খোঁজ খবর নিতেই হবে এবার।

ঃ জি স্যার, তা নেয়াই উচিত।

আলেয়া বেগম বললো– আর বলতে হবেনা ও.সি. সাহেব। শক্ত করে খবর এবার করতেই হবে আমাদের।

ও.সি. সাহেব ফের বললেন– আচ্ছা ম্যাডাম, আমি জানি, আপনাদের বন্দুক-পিস্তল-রিভালভার– সব রকম আগ্নেয় অস্ত্র আছে। এসব থাকতে আপনি এমন নিরস্ত্রভাবে চলাফেরা করেন কেন?

আলেয়া বেগম বললো– সেইটেই তো এ যাবত ভুল করে আসছি আমি। আর এমনটি করবো না।

ঃ না, করবেন না। দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

ঃ জি ও.সি. সাহেব, জি জি। বন্দুক-পিস্তল, যাহোক একটা কিছু সাথে রাখবোই এরপর থেকে।

ঃ না-না, বন্দুক নয়। বন্দুক ভারি জিনিস। ওটা নাড়াচড়া করা সহজ হয়না। বরং পিস্তল নাড়াচাড়া করা খুব সহজ। ওটা টুপ্ করে পকেটে ফেলে দিয়েই ব্যস্ আর কোনো সমস্যা নেই।

ঃ ঠিক ঠিক, আপনি ঠিক বলেছেন ও.সি. সাহেব। এখন থেকে তাই করবো।

ঃ জি-জি, তাই করবেন।

অতঃপর সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ও.সি. সাহেব।

৫

আলেয়া বেগম আলোর আব্বা জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব প্রেসারের রুগী। কয়েকদিন একটানা অসুখে ভুগে গতকাল তিনি উঠে বসেছেন। আগামী এক সপ্তাহকাল ব্যাপী তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে– এই হলো ডাক্তারের নির্দেশ। অধিক নড়ন চড়ন তাঁর জন্যে একদম হারাম।

অথচ আজই তাঁকে বা তাঁর পুত্রকন্যাদের একজন কাউকে তাঁদের চা বাগানে যাওয়াটা একান্ত দরকার। তাঁর পুত্র দুইটি অনেকটা দায়িত্বহীন, অদক্ষ আর কিছু কম বুদ্ধির ছেলে। সেদিক দিয়ে চৌধুরী সাহেবের একমাত্র কন্যা আলেয়া বেগম আলো সবদিক দিয়ে এক্সপার্ট। জ্ঞানবুদ্ধি, দক্ষতা, দায়িত্ববোধ– সব কিছুতেই তার জুটি মেলা ভার।

চৌধুরী সাহেব ভেবে দেখলেন– তাঁর নড়ন-চড়ন নিষিদ্ধ, তাঁর ছেলে দুইটি গত পরশু নানার বাড়িতে বেড়াতে গেছে আজও ফেরার নাম নেই, এখন একমাত্র ভরশা তাঁর মেয়ে আলেয়া বেগম আলো। চা বাগানের প্রয়োজনটা মেটানোর জন্যে আলেয়া বেগমকে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই তিনি তাঁর কন্যা আলেয়া বেগমকে ডেকে নিয়ে বললেন– আম্মাজান, তোমাকে যে একবার একটু আমাদের চা বাগানে যেতে হয়! আমাদের কাউকে না কাউকে আজ সেখানে যাওয়াটা বিশেষ দরকার। অথচ আমি অসুস্থ, নানা বাড়ি থেকে তোমার ভাই দুইটি আজও এলো না। এখন করি কি? তোমাকেই যে যেতে হয় আম্মাজান!

আলেয়া বেগম সবিস্ময়ে বললো– আমাকে?

চৌধুরী সাহেব বললেন– হ্যাঁ আম্মাজান। বাগানের ম্যানেজার সাহেব গতকালই সংবাদ পাঠিয়েছেন। আমি বলবো তা ভুলে গেছি।

ঃ কি ব্যাপার আব্বাজান? খুব জরুরি কাজ কি?

ঃ কাজটা জরুরি কিছু নয়। অথচ যাওয়াটা জরুরি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ একটা মামুলী বিষয় এখন রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। তুমি বোধ হয় জানো, প্রত্যেক বছর আমাদের কাউকে না কাউকে গিয়ে গোটা দুইয়েক পাতা তুলে চা বাগানের নতুন পাতা তোলাটা উদ্বোধন করে দিতে হয়। আমরা উদ্বোধন করে দিলে তবেই শ্রমিকেরা পাতা তোলা শুরু করে।

ঃ তা আমাদের কাউকে না কাউকে কেন আব্বাজান? বাগানের ম্যানেজার সাহেব উদ্বোধন করে দিলে চলে নাকি?

ঃ না, চলে না আম্মাজান। নারী-পুরুষ সকল শ্রমিকই পাহাড়ী অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর অনুন্নত মানুষ। তদের ধ্যান ধারণা আর অনুভুতিই আলাদা। তাদের বিশ্বাস মালিক পক্ষের কেউ না কেউ উদ্বোধন করে দিলে পাতা তোলা কাজটায় তাদের সফলতা আসে। উপার্জনে বরকত আসে তাদের। পরিশ্রম সফল হয় আর উপার্জন বেশী হয়।

ঃ কি অদ্ভুত তাদের বিশ্বাস!

ঃ বিশেষ করে মেয়ে শ্রমিকেরা, আমরা উদ্বোধন করে না দিলে, কিছুতেই কাজে হাত দিবে না। সারা বছর খেতেও নাকি তাদের অভাব দূর হবে না।

ঃ তাজ্জব! তাহলে আমাকে যেতেই হবে আব্বাজান?

ঃ হ্যাঁ যাও। কয়েকবার তো গেছো সেখানে। মেন্ রোডের পাশেই আমাদের বাগান। মাত্র আধাঘন্টা-চল্লিশ মিনিটের পথ। যাতায়াত মিলে সোয়া ঘন্টা দেড় ঘন্টার ব্যাপার। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী সময়ও লাগবে না কাজটায়। যাবে আর আসবে।

ঃ তাহলে আমি একাই যাবো! সাথে আর কেউ থাকবে না?

ঃ একা কেন? তোমার ড্রাইভার মিঃ প্রিন্স তোমার সাথে থাকবে। সেই একাই তো দশজনের সমান। আর লোক কি হবে?

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ তাছাড়া, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। মেন রোডের সোজা রাস্তা। রাস্তায় প্রচুর লোকজন আর যানবাহন অবিরাম যাতায়াত করছে।

ঃ জি-জি।

ঃ এর উপর আমার দো-নালা বন্দুকটা সাথে নিলে–

ঃ না আব্বাজান, নিলে পিস্তলটা সাথে নেবো। ঐ যে সেদিন শুনলেন, ও.সি. মারুফ মোল্লা বলেছিলেন– বন্দুক নাড়া ছাড়া করায় অসুবিধা? এ ছাড়া আল্লাহ না করুন, তেমন বিপদ হলে দুইটি মাত্র কার্টিজ শেষ হওয়ার পর দো-নালা বন্দুক যা লাঠিও তাই।

ঃ তা বটে– তা বটে। তাহলে পিস্তলটাই সাথে নাও। পিস্তলের সব কটা ঘর ভর্তি করে গুলি নাও আর বাড়তি কিছুগুলি তোমার হ্যাণ্ড্ব্যাগে রাখো। বন্দুক সাথে রাখাটা সত্যিই একটা ঝামেলা।

ঃ জি-জি। সেই কথাই বলছি।

ঃ পিস্তলটা প্রিন্সের হাতে দিও। সে সেপাই মার্কা মানুষ। ওটা সামাল করে রাখতে ওর অসুবিধে হবে না।

ঃ জি, তাই হবে আব্বাজান। তা কখন আমাদের যেতে হবে?

ঃ সকালের দিকে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু এখন তো অনেক বেলা হয়ে গেছে। গোছল খাওয়া-দাওয়া করে দুটো-আড়াইটের দিকে রওনা হও। কাজ সেরে তিনটে সাড়ে তিনটের দিকেই ফিরে আসতে পারবে।

ঃ জি-জি।

ঃ তো যাও। প্রিন্সকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তাকেও তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলো।

ঃ জি আচ্ছা।

আলেয়া বেগমেরা বেলা তিনটের মধ্যে এসে চা বাগানে পৌছলো। আলেয়া বেগমকে দেখে মেয়ে শ্রমিকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারা আলেয়া বেগমকেঘিরে নিয়ে চা বাগানে ঢুকলো আর আলেয়া বেগম দুটো পাতা তুলে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ করলো। সাকুল্যে পাঁচ সাত মিনিট লাগলো শেষ করতে।

অতঃপর শ্রমিকেরা পাতা তোলা শুরু করলো আর আলেয়া বেগম বাগানের ম্যানেজার সাহেবের সাথে ম্যানেজারের বাসায় এসে খোলা বারান্দায় বসলো। আলেয়া বেগমের আহ্বানে মিঃ প্রিন্সও এসে বসলো সেখানে। এরপর আলেয়া বেগম ম্যানেজার সাহেবকে বললো– এই পাতা তোলা উদ্বোধন করাটা একটা একেবারেই ফাল্‌তু ব্যাপার– তাই নয় চাচা মিয়া?

ম্যানেজার সাহেব বললেন– জি আম্মাজান, একেবারেই ফালতু। অন্য কোথাও কোনোচা বাগানে এই নিয়ম নেই। এখানেই এটা শুধু একটা রেওয়াজ হয়ে আছে।

ঃ তা নারীপুরুষ মিলে প্রচুর শ্রমিক এখানে কাজ করে দেখলাম। আপনাকেও দেখলাম তারা খুব সম্মান করে। এদের নিয়ে আপনি বেশ আনন্দেই আছেন, না কি বলেন চাচা মিয়া?

ঃ হ্যাঁ আম্মাজান্। আনন্দ-আমেজও আছে যেমন, ঝক্কি-ঝামেলাও আছে তেমন। এই নীচুজাতের কুলি-কামিন্‌রা মাঝে মাঝে এমন সব গোলমাল আর ঝামেলা সৃষ্টি করে যে, সেগুলো সামাল দিতে গলদ-ঘর্ম অবস্থা হয় আমার।

ঃ তাই নাকি? কি রকম– কি রকম?

ঃ রকমের কি আর শেষ আছে আম্মাজান? এই সপ্তাহ খানেক আগে যে ঝামেলা গেলো, তা শুনলে তোমরা অবাক হযে যাবে।

ঃ অবাক হয়ে যাবো?

ঃ যাবেই তো। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা যে।

ঃ ওম্মা! তাই নাকি? তা কি সে ঘটনা বলুন তো চাচা মিয়া, শুনি!

ঃ ফেকু নামের এই বাগানের এক বিবাহিত কর্মী অন্য এক অবিবাহিত (অনূঢ়া) মেয়ের প্ররোচনায় তার বউকে ত্যাগ করে। ফেকু হয়তো ত্যাগ করতো না। কিন্তু ঐ অবিবাহিত মেয়েটা ফেকুকে বলে, "তোমার বউ সতী নয়। তার পেটে যে বাচ্চা আছে, সেটার বাপ তুমি নও। ঐ বাচ্চার বাপ এই বাগানের শ্রমিক মংলু। মংলুর সাথে তোমার বউকে কুকাম করতে আমি অনেকবার স্বচোক্ষে দেখেছি।"

ঃ কি তাজ্জব। তারপর?

ঃ এই কথা শুনেই ফেকু ভয়ানক ক্ষেপে যায়।

ঃ ক্ষেপে যায়?

ঃ হ্যাঁ। "এগুলো সব মিথ্যা কথা। আমি অসতী নই। তুমি আমাকে ত্যাগ করোনা" বলে ফেকুর বউ ফেকুর হাতে পায়ে ধরে কাঁদাকাটি করা সত্ত্বেও ফেকু তাকে ত্যাগ করে। মানে, তালাক দেয়। ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে ফেকুর বউ শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ঃ ওরে বাপ্‌রে! কি সাংঘাতিক ঘটনা! তা কোথায় মেয়েটা আত্মহত্যা করলো? ঐ চা বাগানের মধ্যে?

ঃ না আম্মাজান, আমাদের এই বাংলোর পেচনে বড় যে তালগাছ আর বাঁশঝাড়টা আছে। সেখানে ঐ যে বাংলোর সাথে লাগানো মানে, বাংলোর উপর হেলে পড়া তালগাছ আর বাঁশঝাড়, সেখানে। সেখানে একটা বাঁশের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার আত্মহত্যার ব্যাপারটা যাতে করে দশজনের চোখে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই নাকি সে এখানে এসে গলায় দড়ি দেয়।

ঃ তাজ্জব-তাজ্জব! তারপর কি হলো চাচা মিয়া?

ঃ শুরু হলো আমার হাজার রকমের ঝামেলা। এই নিয়ে দফায় দফায় কয়েকবার শালিশ-দরবার করা হলো, দারোগা-পুলিশ এলো, মানে, পাঁচ সাতটা দিন ঐ ঝামেলাতেই কেটে গেলো।

ঃ তারপর? পুলিশ এসে ফেকুকে ধরে নিয়ে গেলো?

ঃ ফেকুকে পাবে কোথায়? সে তো প্রথম থেকে লাপাত্তা। ঐ প্রতারক মেয়েটার পিঠে কয়েকটা বাড়ি ফেলতেই সে গড়্ গড়্ করে সব ঘটনা উগ্‌ড়ে দিলো। পুলিশ এসেছিলো ফেকুকে ধরতে। ফেকুকে না পেয়ে পুলিশ হুম্‌কি-ধম্‌কি দিয়ে ঐ মেয়েটার বাপ-মাকে বলে গেলো– "ফেকু ফিরে আসার সাথে সাথে খবরটা যেন থানায় পৌঁছানো হয়। নইলে খবর আছে"।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর আর কি! ব্যাপারটা তারপর থেকে থেমে আছে।

গল্পে গল্পে বেলা চারটে ধর-ধর করে নিলো। আলেয়া বেগম আলো সচকিত হয়ে উঠলো বললো– এখন আমরা উঠি চাচা মিয়া। বেলা প্রায় চারটে বেজে গেলো।

বাগানের ম্যানেজার সাহেব শশব্যাস্তে বলে উঠলেন– না না, তা কি করে হয় আম্মাজান। এখানে এসে আপনারা খালি মুখে গেলে আমি স্যারের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

ঃ এখন আর কি মুখে দেবো চাচা মিয়া? যে অসহ্য গরম পড়েছে, সারা গা ভিজে গেছে। চা টা কিছু খাওয়া যাবে না এখন।

ঃ না-না, চা আমি দেবোও না আপনাদের। আমার পিয়নটা ডাব নামাতে গেছে। অন্ততঃ গ্লাস খানেক ডাবের পানি খেয়ে যান।

ম্যানেজার সাহেবের অনুরোধে আরো দশ-পনেরো মিনিট দেরী করে ডাবের পানি পান করলো তারা। আরো আধা ঘণ্টা এক ঘন্টা দেরী করলেও আধা ঘণ্টার পথ, পাঁচটা সোয়া পাঁচটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারতো তারা।

কিন্তু নসীব তাদের বিরুপ। সে সুযোগ তারা পেলো না। দশ পনেরো মিনিট আগে আকাশের ঈশান কোণে সামান্য যে একটু কালো মেঘের সঞ্চার হতে দেখা গিয়েছিলো, এই পনেরো মিনিটের মধ্যে সেই কালো মেঘ বিশাল আকার ধারণ করে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেললো এবং গোটা এলাকা আধার হয়ে গেলো। "কি সর্বনাশ– কি সর্বনাশ" বলে আলেয়া বেগমেরা লাফিয়ে উঠতেই শুরু হলো প্রলয় কাণ্ড। বিপুল বেগে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড় আর আর বৃষ্টি। ঝড় নয়, ভয়ংকর সাইক্লোন। এই সাথে হঠাৎ করে এমন এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবায়ু শুরু হয়ে মেন্ রোড বরাবর ছুটে গেলো যে, রাস্তার দুই পাশের গাছ-গাছড়ার সাথে বিশাল বিশাল গাছগুলো মড় মড় শব্দে ভেংগে পড়ে মেন্ রোডের গোটা রাস্তাটাই ব্লক করে দিলো।

মানুষ বা কোনো যানবাহনের সে পথে যাতায়াত করার কোনো সুযোগ রইলো না। ঘণ্টা খানেক সময় ধরে ঐ তাণ্ডব চললো। ঝড় বৃষ্টি যখন থামলো তখন দেখা গেলো, সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। আঁধারে ঢেকে নিচ্ছে দশদিক। আরো যা মারাত্মক, তা হলো– আগামীকাল সকালে রোড্স্ এ্যাণ্ড হাইওয়েজের লেবারেরা এসে গাছ ও গাছের গুড়ি সরিয়ে রাস্তা সাফ না করা পর্যন্ত কোনো যান বাহনের সামনে পেছনে এক ইঞ্চি অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। চা বাগানের বাড়িঘর সব ইটের হেতু, সেগুলো অক্ষত রইলো বটে, কিন্তু কাঁচা ঘরবাড়ির কোথাও কোনো চিহ্ন রইলো না।

ম্যানেজার সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকে কোনো মতে আত্মরক্ষা করেছিলো তারা সকলেই। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলে ফের বারান্দায় বেরিয়ে এলো তারা। সব দেখে আর সব খবর শুনে মাথায় হাত দিলো আলেয়া বেগম ও প্রিন্স্। আজ আর তাদের ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই শুনে তারা মূহ্যমান হয়ে গেলো। তা দেখে ম্যানেজার সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– চিন্তিত হওয়ার তো কোনো কারণ নেই আম্মাজান! বিপদ আপদ কাউকে বলে কয়ে আসে না। এমনটি তো হতেই পারে। এ নিয়ে এত ভাবছেন কেন?

আলেয়া বেগম চোকচিপে বললো– এখন আমরা থাকি কোথায় আর খাই কি– এটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে গেলো।

ম্যানেজার সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– সেকি সেকি! সমস্যার কি আছে? আপনাদের যাঁরা যখনই আসেন, তাঁদের পাক শাক তো আমার এখানেই হয়।

কেউ তো নিজেরা রেঁধে খান না। আপনাদের খাবার ব্যবস্থাও এখানেই করবো আমি। বাজারে যাওয়ার সুযোগ না পেলেও বাজার সওদা যা কিছু আছে, তাই আমি রেঁধে খাওয়াবো আপনাদের। আশা করি, আমার এখানের রান্নাটা খুব একটা অতৃপ্তিকর হবে না আম্মাজান। সন্ধ্যা সাত-আটটার মধ্যে পাকশাক সব সারা হয়ে যাবে।

ঃ সে না হয় হলো, কিন্তু থাকবো আমরা কোথায়?

ঃ সেকি! আপনাদের বিশাল বাংলো খালি পড়ে আছে। থাকার জায়গার আপনাদের অভাব কি?

ঃ কিন্তু সেই কবে থেকে বন্ধ আছে বাংলো, ঝাড়া-মোছা নেই, ওখানে থাকবো কি করে?

ঃ ঝাড়া মোছাই আছে আম্মাজান। বাংলোর চাবিতো আমার কাছেই থাকে। একদিন পর পর আপনাদের মাইনে করা সুইপার এসে গোটা বাংলো ঝেড়ে মুছে রেখে যায়।

ঃ তাই? কিন্তু এই ঝড়-ঝাপটায় আজ আবার কত ধূলোবালি-খড়কুটা ঢুকে গেছে তার ঠিক কি?

ঃ না-না আম্মাজান, বেশী ঢুকতে পারবে না। দরজা জানালা সব টাইট করে বন্ধ করা আছে তো! যা কিছু ঢুকেছে, আমার এখানে এক ঝাড়ুদারিনি আছে, তাকে ডেকে ঝাড়া মোছা যা কিছু দরকার তা করে দেবো এক্ষণি।

ঃ আচ্ছা! তা করতে পারবেন তো সেটা?

ঃ জি আম্মাজান, অবশ্যই। আপনাদের খানা আপনাদের বাংলোতেই পৌঁছে দেয়া হবে। খেতে গেলেই দেখতে পাবেন সব কিছু চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে।

অগত্যা তাই সই। পাক সারা হওয়া অবধি তাদের অপেক্ষা করতে হলো। পাক শেষে তারা বাংলোতে গিয়ে দেখলো, এক বর্ণও মিথ্যা বলেননি ম্যানেজার সাহেব ঝক্‌ঝক্ করছে সব কিছুই। বিশেষ করে বাংলোর যে কামরায় চৌধুরী সাহেব এসে থাকেন, সেই কামরার খাট-বালিশ-বিছানা সব কিছুই চক্‌চকে ধব্‌ধবে।

একটু পরেই তাদের খানা নিয়ে বাংলোতে এলো ম্যানেজার সাহেবের বাড়িতে পাক করতে ডেকে আনা রাধুনীটা। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসন-কোষণ নিয়ে যাওয়ার সময় আলেয়া বেগমকে একা পেয়ে রাঁধুনিটা বললো– একটা কথা বলতে চাইগো আম্মাজান। বলা আমার উচিত তাই বলতে চাই।

আলেয়া বেগম সাগ্রহে বললো– হ্যাঁ– হ্যাঁ, বলো। সংকোচ করছো কেন?

ঃ বলছি, রাত্রিকালে আপনি ঘরের বাইরে বেরুবেন না আম্মাজান। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকবেন। ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় চারদিকে ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও গরম লাগবে না।

ঃ তা তো বুঝলাম, কিন্তু কেন? চোর- ডাকাতের--

ঃ না গো আম্মাজান, সে কথা নয়--

ঃ তবে?

ঃ ঐ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা মেয়েটার, মানে ফেকুর বউটার কথা বলছিলাম। আপনাদের এই বাংলোর পেছনেই গলায় দড়ি দিয়েছিলো তো!

আলেয়া বেগম চম্‌কে উঠে বললো-- এ্যাঁ! কি বললে-- কি বললে?

ঃ ঐ মেয়েটা এখনো এখান থেকে যায়নি গো মা। পেত্‌নী হয়ে সে এখানেই আছে।

ঃ সেকি - সেকি!

ঃ হ্যাঁ গো মা। গভীর রাতে এই বাংলোর চারপাশে তাকে ঘুরাফেরা করতে অনেকেই দেখেছে।

ঃ ও মাগো! তারপর?

www.boighar.com

ঃ ঘুরাফেরা করে আর কেঁদে কেঁদে কয়, "যে আইবা (অবিবাহিত) মাগীর জন্যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হলো, সেই মাগীকেই হোক আর যে মাগীকেই হোক, দুই তিনটে আইবা (অবিাহিত, অনূঢ়া) মাগীকে না খেয়ে আমি এখান থেকে যাবোনা।

ঃ সেকি! মরেছি- সেকি!

ঃ পুর্ব পাড়ার ঐ বাগদী মেয়েটা রাতে এ দিক দিয়ে যাওয়ার সময় নিজ কানে এ কথা শুনেছে।

ঃ তারপর তারপর?

ঃ এছাড়াও ইদানিং আর এক আলামত দেখা দিয়েছে। রাত বারোটার দিকে ঐ পেত্‌নীটা তার গলায় দড়ি দেয়া বাঁশটাতে খুব জোরে ঠক্ ঠক্ করে কয়েকটা ঠোকড় মারে আর সেই সাথে "পুঁউঁত্- পুঁউঁত্" বলে আওয়াজ দেয়। তার মানে হলো, সে বলতে চায়- সব আইবা মাগীগুলোকে পুঁতে ফেলো।

ঃ হায় আল্লাহ! কি গজব। একি মুসিবতে পড়লাম।

ঃ আরো আছে। রাত আরো কিছু গভীর হলে সে ঐ তালগাছের মাথায় উঠে বসে আর ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুরু করে। কানে পড়লেই বোঝা যায়, কি করুণ তার কান্না।

ঃ ওরে বাপরে! কি সাংঘাতিক। এ কোথায় থাকতে এলাম।

ঃ তাই বলছি, সাবধানে থাকবেন গো আম্মাজান। কখন কোন্ ফাঁকে সে আবার এস ঘরে ঢুকে পরে তার ঠিক কি? ভুৎ-পেত্নীদের তো দরজা জানালা খোলা থাকার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে তারা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে।

মিঃ প্রিন্স্ এতক্ষণ একটু বাইরে ছিলো। এবার সে সেখানে এলে, রাঁধুনীটি বললো– যাই গো মা! আমার অনেক দেরী হয়ে গেলো। আমি তাড়াতাড়ি যাই। আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন।

বাসন বর্তন নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো ম্যানেজার সাহেবের বাড়িতে রাঁধতে আসা মেয়েটা। মিঃ প্রিন্স আলেয়া বেগমকে বললো– কি বললো ম্যাডাম? কি বললো ঐ রাঁধুরী মেয়েটা? আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে না কি যেন বলে গেলো?

আলেয়া বেগম ভীত কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ–হ্যাঁ, ঐ গলায় দড়ি দিয়ে মরা ফেকু শ্রমিকের বউটা পেত্নী হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যু তো, তাই সে এ দুনিয়া থেকে যেতে পারেনি। মানে, ওদের ভগবান ওকে নেয়নি।

মিঃ প্রিন্স ঈষৎ হেসে বললো– তাই নাকি? তা কোথায় আছে?

ঃ এই তো এখানে। আমাদের বাংলোর পেছনে ঐ বাঁশতলা।

ঃ থাক– থাক। বাঁশতলা তালতলা যেখানে খুশী, ও সেখানে থাকুক। আপনি যান ম্যাডাম, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

ঃ শুয়ে পড়বো কি করে? ঐ পেত্নী এসে যদি হামলা করে?

ঃ কি যে বলেন ম্যাডাম! আপনার মতো জ্ঞানী মেয়ের এমনটি ভাবা ঠিক নয়। যে মরে যায়, সে আর ফিরে আসে না। মানে, আসতে পারে না।

ঃ পারে-পারে। যারা ভূৎ-প্রেতের হয় তা ফিরে আসতে পারে। ও মেয়েকে এই বাংলোর চারপাশে ঘুরাফেরা করতে হাজার লোকে দেখেছে।

ঃ দেখেছে?

ঃ চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। সকাল হোক, সে প্রমাণ আমি গোণ্ডা গোন্ডা দেবো।

ঃ বলেন কি?

ঃ তা ছাড়া, যদি জেগে থাকো, তাহলে সেটা তুমি নিজেই টের পাবে।

ঃ কি তাজ্জব ম্যাডাম! এও কি সম্ভব?

ঃ সম্ভব– সম্ভব। আমি কি না জেনেই বলছি?

ঃ আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনি যান, শুয়ে পড়ুন।

ঃ কোথায়?

ঃ ঐ স্পেশাল রুমটায়। আপনার আব্বা এসে যে রুমে থাকেন, সেই রুমটায়।

ঃ আর তুমি?

ঃ আমি ঐ পাশের যে কোনো রুমে শুয়ে পড়বো।

ঃ অসম্ভব। সেটা কিছুতেই হতে পারে না। একা আমি কোথাও থাকতে পারবো না। তাহলে আমি ভয়েই মরে যাবো।

ঃ তাহলে কি করবেন?

ঃ তোমাকেও এসে আমার রুমে থাকতে হবে।

ঃ সেকি! ও রুমের মধ্যে কোনো পার্টিশান নেই, মাঝখানে কোনো পর্দাও ঝুলানো নেই, ঐ ঘরে আমি থাকবো কি করে?

ঃ দেখো প্রিন্স্, বেশী কথা বাড়িও না। তোমাকে থাকতে হবে, এই হলো সাফ কথা। আমার হুকুম।

ঃ কি মুস্কিল! আমি বেগানা পুরুষ হয়ে আপনার ঘরে–

ঃ ফের কথা বাড়াচ্ছো? তুমি আমার ঘরেই থাকবে।

ঃ কি গজব! ওখানে তো ভিন্ন কোনো খাট্ও নেই।

ঃ তুমি আমার খাটেই থাকবে।

ঃ তওবা-তওবা! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন ম্যাডাম? আপনার সাথে একখাটে– মানে, ঐ সিঙ্গল্ খাটে–

ঃ হ্যাঁ, ঐ সিঙ্গল্ খাটে! দুইজন না ধরে তুমি একাই ঐ খাটে, মানে ঐ সিঙ্গল্ খাটে থাকবে।

ঃ আর আপনি?

ঃ আমি খাটের নীচে ঐ কার্পেটের উপর থাকবো। ঐ খাটে দেখেছি– ডাবল ডবল চাদর বালিশ পাতা আছে। একটার উপর আর আর একটা। ওখান থেকে একটা চাদর আর একটা বালিশ এনে কার্পেটের উপর পাতলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

ঃ সেকি– সেকি! তা কি করে হয়?

ঃ ফের কথা? চলো, শুয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে আমি জানালা দরজা বন্ধ করে দেবো গড়িমসি করোনা, চলো–

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। মালিকার হুকুম, প্রিন্স্ সেটা না করে কি করে? বাধ্য হয়ে জামালউদ্দীন প্রিন্স্ আলেয়া বেগম আলোর সাথে ঐ একঘরেই এলো আর আলেয়া বেগমের আপত্তি সত্ত্বেও আলেয়া বেগমের বদলে চাদর বালিশ নিয়ে প্রিন্স্ নিজে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়লো। দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসে প্রিন্সের অনুরোধে আলেয়া বেগমও অগত্যা শুয়ে পড়লো খাটের উপর।

নিমেষ খানেক চুপ্‌চাপ্‌। এরপর জামালউদ্দীন প্রিন্স্‌ আফছোস্‌ করে বললো– বেগানা জেনানার সাথে এক ঘরে থাকার এই গুনাহ্‌ থেকে আমি কোনোদিনই রেহাই পাবো না।

এ প্রক্ষিতে আলেয়া বেগম বললো– আর আমি? জেনানা হয়ে একজন ঈমানদার আর পরহেজ্‌গার মানুষকে খাটের নীচে রেখে আমি যে খাটের উপর রইলাম, আমার এ গুনাহ্‌ই কি মাফ হওয়ার কথা? বিপদে পড়ে থাকতে হচ্ছে তাই–

ঃ মাফ হওয়ার কোনো মওকাই নেই। খাটের উপরে নীচে থাকাটা গুনাহ্‌র কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু শরিয়ত বহির্ভূতভাবে বেগানা দুই নারী পুরুষের একঘরে থাকার গুনাহ্‌ মাফ হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

ঃ কিন্তু আমাদের এই বিপদের কথা কি আল্লাহ তায়ালা বিবেচনা করে দেখবেন না?

ঃ তা কি করবেন, সেটা তার ইচ্ছা। আর কথাবার্তায় না থেকে ঘুমিয়ে পড়ুন ম্যাডাম। অনেক রাত হয়ে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো প্রিন্স। কিন্তু ঘুম এলো না আলেয়া বেগমের চোখে। ভয়ে গুঁড়িশুটি মেরে সে পড়ে রইলো বিছানায়।

কারেন্ট ছিলো না। তাই চুপ্‌ করে পড়ে রইলো আলেয়া বেগম আর চার্জারের টিমটিমে আলোতে ঘনঘন ঘড়ি দেখতে লাগলো। ঘড়িতে যেই বারোটা বাজলো, ব্যস! অমনি সত্যি হলো রাঁধুনী মেয়েটির হুঁশিয়ারী। ঠক্‌ ঠক্‌ করে কয়েকটা বিকট শব্দ হলো বাঁশের গায়ে আর সংগে সংগে আওয়াজ উঠলো– "পুঁউঁত্‌–পুঁউঁত–পুঁউঁত"।

চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলো আলেয়া বেগম। জামালউদ্দীন প্রিন্স্‌ চীৎ হয়ে শুয়েছিলো। আলেয়া বেগম লাফ দিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রিন্সের বুকের উপর। সবলে প্রিন্সকে আঁকড়ে ধরে বললো– বাঁচাও– বাঁচাও–

ভেঙ্গে গেলো প্রিন্সের ঘুম। সে চমকে উঠে বললো– কি হলো– কি হলো?

আলেয়া বেগম বললো– পেত্‌নী– পেত্‌নী। ঐ পেতনী আমাকে ধরলো। বাঁচাও– বাঁচাও।

ঃ পেত্‌নী! কোথায়?

ঃ আমার খাটের পাশে। মানে, এই দেয়ালের একদম ওপাশে।

প্রিন্সকে আরো শক্ত করে ধরে আলেয়া বেগম কাঁপতে লাগলো থর থর করে। বুক থেকে তোলার এজন্য প্রিন্স তাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে বললো– আচ্ছা দেখছি। আপনি নামুন– নামুন, আমার বুক থেকে নামুন।

আরো জোরে আঁকড়ে ধরে আলেয়া বেগম বললো– না-না-, আমাকে জড়িয়ে ধরো। শক্ত করে ধরে রেখো।

ঃ তওবা-তাওবা! একি করছেন? আপনার কি জ্ঞানবুদ্ধি একদম লোপ পেয়েছে। আমার বুকের সাথে বুক লাগিয়ে পড়ে থাকতে আপনার বিবেকে কি একটুও বাধ্‌ছে না? এতটাই বেশরম হয়ে গেছেন আপনি?

বলতে বলতে আলেয়াকে জোর করে বুক থেকে নামিয়ে দিলো প্রিন্স।

"ভ্যুৎ-ভ্যুৎ" বলে আলেয়া বেগম আবার তাকে সবলে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো। প্রিন্স এবার শক্ত কণ্ঠে বললো– দেখুন ম্যাডাম, আমি ফেরেস্তা বা আসমানী পুরুষ নই। আমি রক্ত মাংসের মানুষ। দীলে আমার কামনা লালসা পুরোপুরিই আছে। কামনাকে এভাবে উত্তেজিত করলে আমার ভেতরের পশুকে আর হয়তো সামলাতে পারবো না। আমাকে রক্ষা করুন ম্যাডাম, রক্ষা করুন। অনন্তকাল দোজখবাস থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

কিঞ্চিত হুঁশ ফিরে এলো আলেয়ার। সে বললো– ও, আচ্ছা। বুক থেকে নামছি। কিন্তু আমি সরে যেতে পারবো না। তোমার গায়ের সাথে গা লাগিয়ে থাকবো।

ঃ জি আচ্ছা, তাই সই। তাই করুন। আমার পিঠে পিঠ লাগিয়ে আপনি ঐদিক ঘুরে থাকুন। দোহাই ম্যাডাম, দোহাই।

আলেয়া বেগম অগত্যা তাই করলো। পিঠের সাথে পিঠ লাগিয়ে ঘুরে শুয়ে আলেয়া বেগম বললো– আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে রাখো, শক্ত করে।

"পুঁউঁত্- পুঁউঁত্" শব্দ তখনো থেমে থেমে হচ্ছিলো। আলেয়া ফের বললো– তুমি কি কিছুই শুনতে পাচ্ছো না?

আলেয়া বেগমের এক হাত শক্ত করে ধরে রেখে প্রিন্স বললো– হ্যাঁ, পাচ্ছি। তবে পেত্‌নীর না হয়েও আওয়াজ পাখী-টাখী বা অন্য কিছুর হতে পারে। পেত্‌নী আসবে কোত্থেকে?

ঃ একশো বার পেত্‌নীর। যা শুনেছি, তা ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

ঃ আচ্ছা বেশ। যার আওয়াজ হয় হোক। আপনার হাত আমি শক্ত করে ধরে আছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ঘুমিয়ে গেলে আর ভয় থাকবে না। মানে, ভয় পাবেন না।

অনেক রাত হয়েছিলো। অবশেষে একসময় ঐভাবেই ঘুমিয়ে পড়লো দুইজনই।

কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হলো না। একদম গভীর রাতে ঘর ঘেঁষে দণ্ডায়মান ঐ তাল গাছের মাথা থেকে ভেসে আসতে লাগলো মেয়ে মানুষের কান্না। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার তীক্ষ্ণ আওয়াজে এবার ঘুম ভেঙ্গে গেলো আলেয়া বেগম ও প্রিন্স্

দুইজনেরই। আলেয়া বেগম আঁত্‌কে উঠে বললো– ওরে বাপ্‌রে! এবার ধরবে। পেত্‌নীটা ঘরের মধ্যে এসে আমাকে খাবে। ঘরের মধ্যে আসতে ভুৎ প্রেতের কোনো রাস্তা লাগেনা আমাকে বাঁচাও প্রিন্স। আমাকে শক্ত করে ঠেশে ধরে রাখো। আর বুঝি রক্ষা নেই– আর বুঝি রক্ষা নেই।

ভূমিকম্পের মতো বিপুল বেগে কাঁপতে লাগলো আলেয়া বেগম। এমন মুসিবতে প্রিন্স তার জীবনেও পড়েনি। উপায়ন্তর না দেখে সে উঠে বসলো বিছানার উপর এবং আলেয়া বেগমকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সবলে ঠেশে ধরে রাখলো।

প্রিন্সের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকার ফলে আলেয়া বেগম কিছুটা আশ্বস্ত হলো। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো সে। মিঃ প্রিন্স ঐভাবে ঝিমুতে লাগলো ঘুমে।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলো আলেয়ার। সে চোখ মেলে দেখে, মিঃ প্রিন্স তাকে ঐভাবে আগলে নিয়ে ঘুমিয়ে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। মায়া হলো আলেয়ার। সে তাকে ডাকবে কিনা ভাবতেই, মসজিদ থেকে সশব্দে ভেসে এলো আযান ধ্বনী আর এতে করেই ভেংগে গেলো প্রিন্সের ঘুম। সে আলেয়াকে ডাক দিয়ে বললো– উঠুন ম্যাডাম, উঠে বসুন। আর ভয় নেই। ভোর হয়ে গেছে। বাইরে মুসল্লিরা চলাচল করছেন।

উঠে বসতে বসতে আলেয়া বেগম বললো– এ্যাঁ। ভোর হয়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভোর হয়ে গেছে। অজু করে ফজরের নামাজ আদায় করবেন, উঠুন।

ঃ সুর্য উঠেছে? মানে বাইরে সূর্যের আলো পড়েছে?

ঃ না, সূর্য্য এখনো উঠেনি। তবে ভোর হয়ে গেছে।

ঃ মানে, আঁধার এখনও আছে?

ঃ জি-জি, তা আছে। তবে ফজরের নামাজের ওয়াক্ত পুরোপুরি হয়েছে।

যান, বাথরুমে গিয়ে অজু করে আসুন। আপনি এলে আমি বাথরুমে যাবো।

ঃ জিনা, বাথরুমে আপনি যান। আমি ওখানে যাবো না।

ঃ কেন-কেন?

ঃ এখনো আঁধার আছে। পেত্‌নীটা ওখানে এসে ঢুকে বসে আছে কিনা, কে জানে।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে প্রিন্স বললো– কচি শিশুর মতো কি যে আপনার ভূতের ভয়! আপনার কারবার দেখে আমি অবাক হচ্ছি ম্যাডাম।

ঃ তা হচ্ছো হও। আমার ভয় কিন্তু এখনো কাটেনি।

ঃ তাই বলে ফজরের নামাজটাও আদায় করবেন না?

ঃ করবো-করবো। এখন আমি আমার খাটে যাবো আর তায়াম্মুম করে ওখানেই ফজরের নামাজ আদায় করবো।

তাই করলো আলেয়া বেগম। খাটের উপর ফজরের নামাজ আদায় করে এবার খাটের উপরই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে। বাথরুম থেকে অজু করে এসে মিঃ প্রিন্সও কার্পেটের উপর নামাজ আদায় করলো আর ঘুমিয়ে পড়লো সেখানেই।

সারারাত এক রকম কারো ঘুম নেই। তাই এবার তারা ঘুমে অচেতন হয়ে গেলো এবং বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত কারো ঘুম ভাংলো না।

এদিকে নাস্তাপানি তৈরি করে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও এরা কেউ এলো না আর ঘরের দুয়ার খুললো না দেখে, ম্যানেজার সাহেব এসে ডাকাডাকি শুরু করলেন। ম্যানেজার সাহেবের ডাকে আর কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙ্গলো এদের। দরজা খুলে এরা বাইরে এসে দেখলো, অনেক বেলা হয়ে গেছে। চারিদিকে ঝাঁ-ঝাঁ করছে সূর্যের আলো। ম্যানেজার সাহেব এদের এই দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার কারণ জানতে চাইলে, প্রিন্স বললো– সে অনেক কথা জনাব। আপনি আপনার বাসায় যান। আমরা হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আপনার ওখানে আসছি। তখন বললো সব।

তারা ম্যানেজার সাহেবের ওখানে গেলে, ম্যানেজার সাহেব আলেয়া বেগমকে প্রশ্ন করলেন– কি ঘটনা আম্মাজান? আপনারা এতক্ষণ এভাবে ঘুমিয়ে রইলেন মানে? রাতে কি ঘুমের কোনো বিঘ্ন ঘটেছিলো?

আলেয়া বেগম কম্পিত কণ্ঠে বললো– জি চাচামিয়া, জি-জি। ভয়ংকর বিপদে পড়েছিলাম।

ঃ সেকি! বিপদে?

ঃ জি চাচামিয়া। আমরা পেত্নীর কবলে পড়েছিলাম। পেত্নীর হামলায় সারারাত আমরা ঘুমোতে পারিনি।

ঃ পেত্নীর হামলা মানে?

ঃ মানে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ঐ ফেকুর বউয়ের হামলায়।

ঘটনাটা আগোগোড়া বর্ণনা করে আলেয়া বেগম ফের বললো– ফজরের নামাজের সময় লোকজন সব জেগে উঠলে তবেই আমরা ঐ পেত্নীর হাত থেকে রেহাই পাই।

কাহিনী শুনে অন্যান্যদের সাথে বিকট শব্দে হেসে উঠলেন ম্যানেজার সাহেব। বললেন– ভূয়া-ভূয়া, সব ভূয়া। আপনারা নিছকই এক ধাঁধাঁর মধ্যে ছিলেন। ভূৎ-পেত্নী বলে ওখানে কিছু নেই।

ঃ নেই?

ঃ না। আসলে, ভূৎ-পেত্নী বলে দুনিয়ার কোথাও কিছু নেই।

ঃ তবে যে এত সব ঘটনা ঘটলো?

ঃ সবই গুজব। আরো দুই একজনের মুখে এই গুজব শুনে আমরা তদন্ত করে দেখেছি– সবই কাকতালীয় ব্যাপার। কাঠ ঠোক্‌ড়া পাখী এসে মাঝে মাঝে ঐভাবে বাঁশ ঠোকায় আর "কুত্‌পাখী" না কি যেন এক পাখী আছে, অনেক রাতে সেই পাখী এসে ঐভাবে কুঁউঁত্‌ কুঁউঁত্‌" আওয়াজ দেয়। আর তালগাছের ঐ কান্নাটা কোনো পেতনীর কান্না নয়। শকুনের বাচ্চার কান্না। মা-শকুনকে না দেখলে বাচ্চাটা ঐ রকম ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। যে জানে না, সে ঐ কান্নাটাকে মানুষের কান্না ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না।

এবার আলেয়া বেগম ও মিঃ প্রিন্স একসাথে বললো– সেকি–সেকি" এই ঘটনা?

ঃ একদম এই ঘটনা।

ঃ হায় আল্লাহ! আমরা খামাখাই সারারাত ভয়ে সারা হলাম?

ঃ খামাখাই–খামাখাই। নাস্তা পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আগে নাস্তাপানি খেয়ে নিন। পরে চলুন, তালগাছের পেত্নীটাকে দেখিয়ে আনি আপনাদের।

তাই করলেন ম্যানেজার সাহেব। নাস্তার পরে গিয়ে তালগাছে নাড়া দিয়ে শকুনের বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দিলেন। এরপর বললেন– আজ রাতে থাকলে, কাঠঠোক্‌ড়ার ঐ বাঁশ ঠোকানো আর কুঁৎ পাখীর ঐ পুঁত্‌-পুঁত্‌ আওয়াজটাও দেখাতে পারতাম।

সব কিছু দেখে ও শুনে উভয়েই সংকুচিত হয়ে গেলেন শরমে।

অতঃপর ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বেলা এগারোটার মধ্যে রাস্তার গাছ সরানো শেষ হয়ে গেলো। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো আলেয়া বেগম ও প্রিন্স্‌। মিঃ প্রিন্স্‌ গাড়ি চালাতে লাগলো আর আলেয়া বেগম আলো মিঃ প্রিন্সের ঐ সংযম ও বাসনা কামানাকে জয় করার অপূর্ব শক্তি নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগলো– জীবনে কাউকে শাদি করলে, এই ইন্দ্রজিৎ, এই অতুলনীয় আর মনোমুগ্ধকর চরিত্রের পুরুষ ছাড়া আর কাউকেই সে শাদি করবে না।

৬

চা বাগান থেকে ফিরে এসে আলেয়া বেগম আলো জামালউদ্দীন প্রিন্সকে বললো– মিঃ প্রিন্স্‌ তুমি বাসায় গিয়েই তোমার হাতেম আলীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো। জরুরি দরকার আছে।

জামালউদ্দীন প্রিন্স বললো– জি আচ্ছা ম্যাডাম।

ঃ খুব জরুরি দরকার। সে আসতে যেন দেরী না করে। আমি ওর পথ চেয়ে বসে থাকবো কিন্তু।

ঃ জি আচ্ছা ম্যাডাম, জি আচ্ছা। ও দেরী করবে না।

দ্রুত বাসায় ফিরে গেলো প্রিন্স এবং কিছুক্ষণ পরেই হাতেম আলী এসে আলেয়া বেগমের সামনে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো এবং বললো– আমাকে নাকি ডেকেছেন ম্যাডাম?

সালামের জবাব দিয়ে আলেয়া বেগম বললো– হ্যাঁ, একটু জরুরি দরকার আছে।

ঃ কি দরকার ম্যাডাম?

ঃ আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

ঃ কাজ? জি হুকুম করুন, কি করতে হবে?

ঃ আমাকে একটা ভালো ড্রাইভার খুঁজে দিতে হবে।

ঃ ভালো ড্রাইভার? সেকি, কার জন্যে ম্যাডাম?

ঃ আমার জন্যে।

হাতেম আলী থম্‌কে গেলো। বললো– আপনার জন্যে! কি তাজ্জব! ভাইজান তো আছেনই। আবার ড্রাইভার কি করবেন?

আলেয়া বেগম নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো– না, তোমার ভাইজান থাকছেন না।

ঃ থাকছেন না মানে? থাকছেন না কেন?

ঃ আমি তাকে রাখছিনে।

চমকে উঠলো হাতেম আলী। বললো– হায় আল্লাহ! কি গজব! কোনো গোলমাল হয়ে গেছে নাকি ম্যাডাম?

আলেয়া বেগম বললো– হ্যাঁ, গোলমাল তো একটা হয়েছেই।

ঃ হায়রে নসীব! গতকাল আপনারা চা বাগান থেকে ফিরে আসে নি। তাহলে এরই মধ্যে কি গোলমালটা হয়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, এরই মধ্যেই।

ঃ খুব বড় ধরনের বেআদবী, মানে দুর্ব্যবহার কি করে ফেলেছেন ভাইজান?

ঃ দুর্ব্যবহার! কার সাথে?

ঃ আপনার সাথে।

ঃ তুমি কি তা বিশ্বাস করো?

ঃ জি?

ঃ তোমার ভাইজান আমার সাথে কোনো বেয়াদবী বা দুর্ব্যবহার করতে পারে, তুমি তা বিশ্বাস করো?

আলেয়া বেগমের আগের কথায় হাতেম আলী ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়েছিলো। মৃদু মৃদু সে কাঁপছিলোও বটে। এবার তার বুক থেকে পাথর নেমে গেলো। সে স্বাভাবিককণ্ঠে বললো– জিনা ম্যাডাম। দুনিয়া উলট পালট হয়ে গেলেও ভাইজান আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে– এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।

ঃ তবে বলছো যে?

ঃ আপনি যে বললেন– আপনি তাকে রাখবেন না?

ঃ ওরে পাগল, রাখবোনা মানে তাকে দিয়ে আর গাড়ি চালিয়ে নেবো না। সে অন্য কাজ করবে।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! তাই বলুন? আমাকে বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন ম্যাডাম।

www.boighar.com

ঃ সবকিছু না শুনেই যদি ভয় পাও, তাহলে আর কি করবো? তা সে যাক। মিঃ প্রিন্সকে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে না নিলে, গাড়ি চালানোর জন্যে আমার যে একটা ড্রাইভার লাগবে– সেটা বুঝতে পারছো তো?

ঃ জি ম্যাডাম, জি–জি। পারছি।

ঃ তাহলে অতি সত্বর একটা ড্রাইভার খুঁজে দাও আমাকে। মিঃ প্রিন্সের মতো এতোটা না হলেও, সে লোকটা বেশ সৎ হওয়া চাই।

ঃ সৎ লোক? এখানেই তো বিপদ ম্যাডাম! সৎ ইয়ংম্যান পাওয়া খুবই দুষ্কর।

ঃ ইয়ংম্যান না হোক, সৎ এজেড্‌ম্যান, মানে বয়োস্কলোকও কি পাওয়া যাবে না?

ঃ বয়স্কো লোক?

ঃ হ্যাঁ। কোনো সৎ মুরুব্বী মানুষ?

ঃ জি ম্যাডাম, জি। মুরুব্বী লোক নিলে সৎলোক পাওয়া যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না।

ঃ হবে না তো?

ঃ না ম্যাডাম, না। বয়স্কো ড্রাইভারদের মধ্যে অনেক সৎলোক আছে।

ঃ তাহলে দাও, তাদেরই একজনকে এনে দাও।

ঃ বললে আগামীকালই একজনকে এনে আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি ম্যাডাম। এমন একজন আমার হাতেই আছে।

ঃ আছে? ইউরেকা! তাহলে তাকেই এনে দাও।

ঃ সে তো কালই আসতে পারবে না ম্যাডাম। মাসের আর চারপাঁচ দিন আছে। যেখানে সে এখন কাজ করে এই চার পাঁচদিন তাকে সেখানেই কাজ করতে হবে ম্যাডাম।

ঃ তাই? কিন্তু তারপর তার সে মুনিব যদি তাকে ছাড়তে রাজী না হন?

ঃ রাজী আছেন ম্যাডাম, রাজী আছেন। ঐ ড্রাইভার বেশী বেতন চাওয়ায়, তাকে মাসের প্রথম তারিখেই ছাড়তে রাজী আছেন। তাকে বলেছেন– "আমি বেশী বেতন দিতে পারবো না। যদি বেশী বেতন কোথাও পাও, তাহলে সেখানে চলে যাও। আমি মোটেই না– খোশ হবোনা। তুমি গরীব মানুষ। দু'টো টাকা বেশী পেলে আমি বরং খুশীই হবো।"

ঃ মারহাবা–মারহাবা! যতটাকা বেতন চায়, আমি তাই দেবো। তুমি ওকেই তাহলে এনে দাও।

ঃ বেশী বেতন দিলে তাকে এনে দিতে আর মোটেই সমস্যা নেই ম্যাডাম। এই চার-পাঁচটা দিন পরেই তাকে পেয়ে যাবেন।

ঃ ব্যাস্! বিরাট এক দুঃশ্চিন্তা কেটে গেলো।

একই ইতস্ততঃ করে হাতেম আলী ফের বললো– জিনা ম্যাডাম, দুঃশ্চিন্তা খানিকটা থেকেই গেলো।

আলেয়া বেগম শংকিত কণ্ঠে বললো– মানে?

হাতেম আলী বললো– মানে, লোকটা যেমনই সৎ তেমনই খোলা মনের সাদাসিদে মানুষ। কিন্তু সে তো পিস্তল-বন্দুক কিছুই চালাতে জানে না ম্যাডাম। পথে বিপদ-আপদ হলে, আমার ভাইজানের মতো সে তো কিছুই করতে পারবে না। মানে আপনাকে হেফাজত করতে পারবে না।

হাঁফ ছেড়ে আলেয়া বেগম বললো– তোমার ভাইজানই সব সময় আমার সাথে থাকবে রে অবোধ। আমি যেখানেই যাবো, পিস্তল বন্দুক নিয়ে তোমার ভাইজানই সব সময় আমার সাথে থাকবে। আমি বাড়িতে থাকলে সে আমার সাথে বসে তার কাজ করবে, বাইরে বেরোলে পিস্তল বন্দুক নিয়ে সে আমার সাথে বেরোবে। মানে, আমার বডিগার্ড হয়ে থাকবে সে।

ঃ সোবহান আল্লাহ– সোবহান আল্লাহ! আর কোনো সমস্যা নেই। চার-পাঁচদিন পরই ঐ মুরুব্বী ড্রাইভারকে এনে দেবো আমি।

০০০ ০০০ ০০০

অতঃপর আলেয়া বেগম আলো তার পিতার কাছে এসে বললো– আব্বাজান, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আপনি সেটা সমর্থন করবেন কিনা, আমি তা জানতে চাচ্ছি।

তার পিতা জহিরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বললেন– সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

ঃ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার ড্রাইভার জামালউদ্দীন প্রিন্সকে আমি লেখাপড়া শেখাবো। সে আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গাড়িতে বসে থাকবে। কিন্তু তাকে দিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে নেবোনা। ঐ ছোট কাজ তাকে আর করতে দেবো না।

ঃ বাঃ! সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু সে লেখাপড়া শিখতে লাগলে আর তাকে গাড়ি চালাতে না দিলে তোমার গাড়ি চালাবে কে?

ঃ ড্রাইভার একটা পেয়ে গেছি আব্বাজান। সৎ চরিত্রের এক মুরুব্বী ড্রাইভার। এ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।

ঃ মারহাবা– মারহাবা। তাহলে তো একটা মস্তবড় সোওয়াবের কাজ হয়। তাকে লেখাপড়া শেখানোর কথা আমিও অনেকবার ভেবেছি।

ঃ আপনি বলেছিলেন, একমাত্র লেখাপড়াটা না-থাকা ছাড়া, এমন গুণ নেই যা আমার ড্রাইভার ঐ জামালউদ্দীন প্রিন্সের মধ্যে নেই। এই সাথে তার তার মধ্যে লেখাপড়াটাও থাকতো যদি, তাহলে তার মতো এত দামী আর উন্নত মানুষ গোটা দেশে দশটা পাওয়া যেতো না। বলেছিলেন না?

চৌধুরী সাহেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন– জরুর-জরুর। এর মধ্যে তিল পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আবার বলছি– সে যদি কিছুটা লেখাপড়া জানতো, তাহলে অনেক বড় ঘরের অনেক বেশী সুন্দরী মেয়ের বাপ তাকে জামাই করার জন্যে উঠে পড়ে লাগতো।

ঃ এখন যদি সে লেখাপড়া শিখে, তাহলে লাগবেনা?

ঃ আলবত-আলবত! অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা যদি সে পাশ করে ফেলে ইতিমধ্যে, তাহলে অবশ্যই লাগবে। তখন সে যে কোনো বড় ঘরের জামাই হবার উপযুক্ত হয়ে যাবে।

ঃ আপনার ঘরের জামাই হবার উপযুক্ত হবেনা?

উদ্বেলিত হয়ে উঠে চৌধুরী সাহেব বললেন– হোয়াট্! কি বললে– কি বললে? আমার ঘরের জামাই? কি আনন্দ কি আনন্দ! এ রকম চিন্তাভাবনা যদি করে থাকো তুমি, তাহলে যে আমি কত খুশী হবো, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না সত্যি কি তুমি তাকে শাদি করতে চাও?

আলেয়া বেগম সলজ্জ কণ্ঠে বললো– জি আব্বাজান! আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে–

কথা শেষ করতে না দিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন– আমার আপত্তি? তুমি যদি এখনই তাকে শাদি করতে চাও, মানে এই লেখাপড়া না জানা অবস্থাতেই,

তাহলেও আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। তাতেও আমি বরং যথেষ্ট খুশী হবো।

ঃ ম্যাট্রিক পাশ করতেও তার বেশী সময় লাগবে না আব্বাজান। তার কথাবার্তায় আমি বুঝতে পেরেছি, প্রাইমারীতো বটেই, মাইনর পর্যন্তও পড়াশুনা করা আছে তার। আর বছর চারেক পড়লেই সে ম্যাট্রিক পাশ করবে।

ঃ আম্মাজান!

ঃ তাকে একটা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেবো। নাম থাকবে ঐ হাইস্কুলের খাতায়, কিন্তু তাকে বাড়িতে পড়াবো আমি। পরীক্ষা ঐ হাইস্কুল থেকে দেবে সে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আর বছর চারেক পড়লেই ম্যাট্রিক পাশ করবে সে আর চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে।

ঃ আরে-আরে! সে কথা ভাবছো কেন? তার উপার্জন করে খাওয়াটা তো জরুরি নয়। আল্লাহর রহমে আমার যথেষ্টই আছে। ঘরজামাই হয়ে আমার সংসারটা দেখাশোনা করলেই তো স্বচ্ছন্দে চলে যাবে তোমাদের। এখনই তাকে শাদি করো আর আমার সংসারে থেকেই তাকে লেখাপড়া শেখাও।

ঃ সেটা হয়তো নাও হতে পারে আব্বাজান। ঘরজামাই হয়ে থাকাটা পছন্দ তার নাও হতে পারে।

ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাও বটে - তাও বটে। কিন্তু তাতেও আমি নাখোশ নই। আমার সংসারে না থেকে পৃথক সংসার পেতে থাকলেও আমি একই রকম খুশী থাকবো। মোদ্দাকথা, এই ছেলেকে হাতছাড়া করতে চাইনে আমি। এর সাথে তোমার শাদি হোক, এইটেই আমার ঐকান্তিক কামনা। আমার আকিঞ্চন।

এই সময় বাড়ির বাজার সরকার এসে চৌধুরী সাহেবকে বললো– হুজুর, একজন মুরুব্বী আপনার সাথে দেখা করতে চান।

চৌধুরী সহেব বললেন– মুরুব্বী?

বাজার সরকার বললো– জি হুজুর। বহুদূর থেকে মুরুব্বীটি এসেছেন। চেহারা-লেবাস সবই উস্কো-খুস্কো। শ্রান্তিতে নূয়ে পড়েছেন বেচারা।

ঃ তাইনাকি - তাইনাকি? যাও- যাও, তাকে এখনই আর এখানেই পাঠিয়ে দাও।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর–

চলে গেলো বাজার সরকার। চৌধুরী সাহেব তাঁর মেয়ের সাথে ড্রইংরুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি তাঁর মেয়ে আলেয়া বেগমকে বললেন– তুমি

বাড়ির ভেতরে যাও তো আম্মাজান যিনি এসেছেন, তাঁর সাথে আমি এখানেই কথা বলি।

আলেয়া বেগম বাড়ির ভেতরে চলে গেলো। একটু পরেই টল্‌তে টল্‌তে সেখানে এসে হাজির হলেন আগন্তুক মুরুব্বী।

তার দিকে তাকিয়েই চৌধুরী সাহেব উম্মতের মতো লাফিয়ে উঠে বললেন– এ্যাঁ! কে-কে? একি রুমমেট্ তুমি? কামালউদ্দীন সাহেব, তুমি? কি তাজ্জব– কি তাজ্জব– বলতে বলতে জহিরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর রুমমেট কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেবকে। তাঁকে ধরে এনে সোফা সেটে বসাতে বসাতে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– একি দোস্ত, হঠাৎ তুমি এখানে? একি চেহারা হয়েছে তোমার?

বলেই তিনি উঠে গিয়ে ফ্যানের জোর বাড়িয়ে দিলেন এবং চাকর-চাকরাণীদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে বললেন– এই, তোমরা কে কোথায় আছো? শিগগির সরবতের ব্যবস্থা করো, ডাব কেটে আনো, কুইক্– কুইক্–

চৌধুরী সাহেবের ব্যস্ততা দেখে তার রুমমেট কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেব শ্রান্তকণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন– থাক্–থাক্, ব্যস্ত হবেন না দোস্ত। বহুদূর থেকে এসেছি তো! তাই ঝড়ের কাকের মতো অবস্থা হয়েছে আমার। একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ তা হয়তো যাবে। কিন্তু আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি– দীর্ঘদিন পর আমার এই পরমবন্ধু হঠাৎ একদম আমার বাড়িতে এসে হাজির! এর কারণটা কি। কোনোদিনেই আমার বাড়িতে কখনো আসেন নি! আজ হঠাৎ বিনা কারণে তো তুমি এতদূরে আসোনি।

ঃ জি না দোস্ত। সম্ভবত বিপদে পড়ে আমি এখানে এসেছি। আমার একমাত্র ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে আমি এতদূর পর্যন্ত এসেছি।

ঃ খুঁজতে খুঁজতে মানে? আপনার ছেলে কি হারিয়ে গেছে?

ঃ জি দোস্ত, হারিয়েই গেছে।

ঃ কি গজব! খুব কম বয়সী ছেলে বুঝি?

ঃ জিনা, জোয়ান ছেলে দোস্ত। সাবালক ছেলে।

ঃ সেকি! সাবালক ছেলে হারিয়ে গেলো মানে? মাথায় কোনো গোলমাল আছে কি? মানে, মস্তিষ্ক বিকৃতির কোনো ব্যাপার?

ঃ জিনা দোস্ত, সে জন্যে নয়। সে হারিয়ে গেছে আমার দোষে।

ঃ তোমার দোষে।

ঃ কি। আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ঃ জি গজব! তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছো? তাড়ালে কেন?

ঃ এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে দোস্ত। আমার ছেলের চেহারা খুব সুন্দর। তার উপর বিলেত থেকে লেখাপড়া করে আসা ছেলে।

এই ছেলের সাথে তার নষ্টা মেয়ের শাদি দেয়ার জন্যে ঐ প্রতারক কিছুটা বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে আমাকে হাত করে ফেলে। তার প্রতারণায় আমি এতটাই বিভ্রান্ত হই যে, ঐ নষ্টা মেয়েকে শাদি করতে কিছুতেই রাজী না হওয়ায়, আমি আমার ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিই।

ঃ তারপর?

ঃ তারপরই ঐ মেয়ের সব কীর্তি ফাঁশ হয়ে যায়। একাধিক নাগরের সাথে লীভ্টুগেদার করার ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়।

ঃ আচ্ছা?

ঃ শেষ পর্যন্ত তার কোনো নাগরই তাকে শাদি করতে রাজী না হওয়ায়, নিরুপায় হয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করে।

ঃ কি তাজ্জব– কি তাজ্জব! তারপর?

ঃ তারপর পুলিশের চাপে পড়ে মেয়ের বাপ সব ঘটনা স্বীকার করেছে আর মেয়েকে আস্কারা দেয়ার দায়ে বিচারে মেয়ের বাপের কারাদন্ড হয়েছে।

ঃ সাব্বাস! ঠিক হয়েছে।

ঃ তারপর ভুল ভেঙ্গেছে আমাদেরও। ছেলেকে অন্যায়ভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার অনুশোচনা সহ্য করতে না পেয়ে আর ছেলের মায়ের চাপে পড়ে এখন ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। খুঁজে না পেলে স্বামী-স্ত্রী কেউ আমরা বাঁচবোনা। ছেলের শোকেই আমরা শেষ হয়ে যাবো।

ঃ কি বিচিত্র ঘটনা। তা তোমার ছেলে এখানে এসেছে, এটা ধারণা করলে কি করে?

ঃ অনুমানের উপর দোস্ত। সন্ধ্যার সময় অনাহারে আর শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ছেলে এই দিকের ষ্টেশনে এসে উঠেছে, তা ষ্টেশানে এসে জেনেছি। যে ধকল তার উপর দিয়ে গেছে তাতে করে ট্রেনে উঠার পরই তার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। তার ঘুম ভাংতে সকাল হওয়ার কথা আর ট্রেন থেকে নামলে তার তোমাদের এই ষ্টেশানে বা এই ষ্টেশানের আগে পরে কোনো ষ্টেশানে নামার কথা। সবই আমার অনুমান। অনুমানের বাইরেও কয়েক ষ্টেশানে নেমে আমি খোঁজা খুঁজি করেছি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ তোমার বাড়ি এই ষ্টেশানের কাছে, আমি জানতাম। তাই এখানে নেমে তোমার এখানে এসেছি। আগে তোমাদের এলাকায় খোঁজ করে দেখি। ব্যর্থ

হলে এই ষ্টেশানের আগের পেছনের সব স্টেশানেই যাবো আর খোঁজ করে দেখবো। এরপর আমার নসীব।

ঃ আচ্ছা। তা আমার বাড়ি তুমি চিনতে পারলে কি করে?

ঃ চিনবোনা? বাপ্‌রে! এ এলাকায় তুমি কি মস্তবড় মানুষ। যাকেই তোমার বাড়ির কথা বলেছি, সেই সংগে সংগে দেখিয়ে দিয়েছে পথ। শেষে তো একজন তোমার বাড়ি পর্যন্ত এসে তোমার এক কর্মচারীর হাওলা করে দিয়ে গেলো আমাকে।

ঃ সাব্বাস! পরম করুণাময় তার কল্যাণ করুন।

ঃ তা পেয়েছো কি এমন কোনো ছেলের সন্ধান? আমার ছেলে তোমাদের এখানে কোথাও এসেছে বলে কি জানা আছে তোমার?

ঃ না দোস্ত। বিলেত থেকে লেখাপড়া করে আসা ছেলে কেউ এদিকে এসেছে বলে আমাদের কারো জানা নেই।

কামালউদ্দীন সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন-- জানা থাকবে না দোস্ত। এতটা উমদা নসীব আমার নয়। আমাকে আবার তাহলে উঠতে হয়। দেরী করে আর লাভ কি?

ঃ লাভ কি মানে? কতদূর থেকে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে এসেছো তুমি। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে তোমার নাজেহাল অবস্থা। দুই তিনদিন বিশ্রাম না নিয়ে আমার বাড়ি থেকে তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে?

ঃ না দোস্ত্, তা হয় না।

ঃ হয়-হয়, একশোবার হয়। তুমি বললেই আমি শুনবো?

কিছুক্ষণ এই নিয়ে চললো রশি টানাটানি। শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়ে থামলেন কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেব। সরবত-ডাব খেয়ে ওখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তারপর দোস্ত জহিরউদ্দীন ফৌজদার সাহেবের সাথে তাঁর বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন কামালউদ্দীন ফৌদার সাহেব।

ooo ooo ooo

একদিন পরের কথা। জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব আর তাঁর মেয়ে আলেয়া বেগম আলো ড্রইং রুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এই সময় সদ্য বিলেত থেকে আসা আবু তালেব নামের পাশের বাড়ির এক ছেলে তাঁদের সাথে দেখা করতে এলো আর গল্প-আলাপে লিপ্ত হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ গল্প আলাপ চলতেই মিঃ প্রিন্স গাড়ির চাবি দিতে ড্রইং রুমে এলো। উল্লেখ্য যে, নতুন ড্রাইভার আসতে আরো দুইতিন দিন দেরী থাকায় মিঃ প্রিন্সই গাড়ি চালাচ্ছে এখনো।

বইঘর.কম ও রোকন

মি: প্রিন্সের উপর নজর পড়তেই আবু তালেব মিয়া লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিপুল বিস্ময়ে বললো– আস্সালামু আলাইকুম। একি স্যার, একি! আপনি এখানে?

মি: প্রিন্স্ সালামের জবাব দিতে না দিতেই আলেয়া বেগম সশব্দে বলে উঠলো– আরে দূর! কাকে কি বলছো? ও তোমার স্যার হলো কোথায়? ওতো আমার গাড়ির ড্রাইভার।

আবু তালেব প্রতিবাদ করে বললো– সে কি! গাড়ির ড্রাইভার হবেন কেন? উনি আমার স্যার! আমার ডাইরেক্ট্ টিচার।

ঃ ডাইরেক্ট্ টিচার! ও কোথায় টিচার ছিলো তোমার? প্রাইমারী স্কুলে?

ঃ না-না–

ঃ হাই স্কুলে?

ঃ না।

ঃ কলেজে?

ঃ না।

ঃ ভারসিটিতে?

ঃ হ্যাঁ। তবে এদেশের কোনো ইউনিভারসিটিতে নয়। ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড্ ইউনিভারসিটিতে।

ঃ আরে দূর! পাগল কাঁহাকার। কাকে ভেবে কাকে কি বলছো? এই লোক অক্সফোর্ড্ ইউনির্ভাসিটির শিক্ষক ছিলেন?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। বলছিইতো ইনি অক্সফোর্ড্ ইউনিভারসিটির ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। ওখানেই ইংরেজিতে পি.এইচ.ডি. করার পর ওখানেই উনি ইংরেজির অধ্যাপক হন। ওখানেই আমি উনার কাছে বি.এ. ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছি। এরপর আইন পড়ে ওখানেই আমি এ যাবত প্যাকটিস্ করলাম, মানে হাত পাকালাম। ইনি আমার ডাইরেক্ট্ টিচার।

ঃ সেকি– সিকি। তুমি ভুল করছো না তো? কি তাজ্জব কথা বলছো তুমি আবু তালেব!

ঃ ভুল করবো মানে? আমি পাগল না মাথা খারাপ মানুষ? আমি আমার স্যারকে চিনতে পারবো না? ইনিই সেই অক্সফোর্ড্ ইউনিভারসিটির অধ্যাপক আর আমার স্যার।

ঃ তাজ্জব! তুমি যে তাজ্জব করলে আমাকে।

ঃ তাজ্জব তো আমিও হচ্ছি আপা। বিলেত থেকে লেখাপড়া করে আসা মানুষকে বলছেন, সে আপনার গাড়ির ড্রাইভার?

জহিরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব এবার উদ্বেলিত হয়ে উঠে বললেন– কি আশ্চর্য– কি আশ্চর্য! এই মি: প্রিন্স্ বিলেত থেকে লেখাপড়া করে আসা লোক?

আবু তালেব বললো– জি- জি, সেই কথাই তো বলছি আমি জনাব।

চৌধুরী সাহেব তৎক্ষণাৎ উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলেন– এই, তোমরা কে কোথায় আছো? আমার ঐ আগন্তুক বন্ধুটাকে ডেকে আনোতো শিগগির। উনি বলছেন, তাঁর ছেলে দেখতে খুবই সুন্দর আর বিলেত থেকে লেখাপড়া করে আসা ছেলে। শেষ পর্যন্ত এও তো হতে পারে যে, এই মিঃ প্রিন্সই তাঁর সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে! উনি এসে দেখে যাক একবার।

www.boighar.com

আবু তালেবের কথার প্রেক্ষিতে বাড়ির অনেক লোকই সেখানে এসে জুটেছিলো। হুকুম পাওয়ার সংগে সংগে কয়েকজন দৌড়ে গেলো বাড়ির ভেতর। একটু পুরেই তারা চৌধুরী সাহেবের রুম্‌মেট্ কামাল উদ্দীন ফৌজদারকে ডেকে আনলো সেখানে। কামালউদ্দীন সাহেব সেখানে আসতে আসতে বললেন– কৈ, কোথায় আমার ছেলে? কাকে এঁরা ছেলে ভাবছেন আমার?

জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বললেন– আমি ভাবছি দোস্ত, আমি ভাবছি। দেখোতো, আমার মেয়ের গাড়ির ড্রাইভার ঐ ছেলে তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে কিনা?

প্রিন্সের দিকে চেয়েই উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলেন কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেব। প্রিন্সের দিকে ছুটে যেতে যেতে তিনি বললেত লাগলেন– একি! এইতো–এইতো। এইতো আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে জামালউদ্দীন, জামালউদ্দীন প্রিন্স্। – বলেই তিনি দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন প্রিন্সকে এবং আকুলকণ্ঠে বলতে লাগলেন– ওরে আমার বাছারে! তুমি এখানে এসে আছো? তোমাকে আমি দেশময় খুঁজে বেড়াচ্ছি তন্ন তন্ন করে আর তুমি এই বাড়িতে এসে আছো বাছা?

জামালউদ্দীন প্রিন্সও বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলো– একি আব্বাজান আপনি! আপনি এখানে?

ঃ তোমার খোঁজেই বাপজান। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতেই এখানে এসে পড়েছি আমি। চলো বাপজান, এবার বাড়িতে ফিরে চলো। তোমার শোকে তোমার আম্মা দিউয়ানা বনে গেছে। মাথা কুট্‌ছে দেয়ালে।

ঃ তার মানে! আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলছেন?

ঃ জি বাপজান। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তুমি বাড়িতে ফিরে চলো বাপ্! আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। ঝোঁকের মাথায় তোমার প্রতি আমি যে অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছি, যে অমানুষিক আচরণ করে ফেলেছি, সে ভুল আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি বাপজান। মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি। তোমার এই বৃদ্ধ পিতার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তুমি বাড়িতে ফিরে চলো বাপ্!

ছেলেকে আঁকড়ে ধরে ফৌজদার সাহেব আকুলি বিকুলি করতে লাগলেন। জামালউদ্দীন প্রিন্স তার পিতাকে এবার জড়িয়ে ধরে নিয়ে জহিরউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কাছে আনলো এবং চৌধুরী সাহেবের পাশে বসিয়ে বললো– এখানে বসুন আব্বাজান আপনি এখন অত্যন্ত অস্থির আছেন, উদ্বেলিত আছেন। এখানে বসে আগে বিশ্রাম নিন, সব কথা পরে হবে।

প্রিন্সের পিতা ঐ একই কণ্ঠে বললেন– না–না, তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছো কিনা, সেটা আগে বলো। নইলে আমি বিশ্রাম নিতে পারবো না, স্থির হতেও পারবো না।

জহিরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব তৎক্ষণাৎ ফৌজদার সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বললেন– দিয়েছে দোস্ত, দিয়েছে। তুমি তোমার ভুল স্বীকার করেছো যখন, তখন কি তোমার ছেলের মনে আর কোনো অভিমান থাকতে পারে? ঈমানদার আর পণ্ডিত মানুষ ছেলে তোমার। সে কি অনুতপ্ত পিতার কোনো অপরাধ রাখতে পারে মনে?

ঃ বলছো দোস্ত?

ঃ জি-জি। তোমার ছেলেকে যে আমি সর্বোতভাবে চিনি দোস্ত। তার মতো সৎ ছেলে দেশ খুঁজে দশটা পাওয়া ভার। তুমি এবার শান্ত হয়ে বসো দোস্ত আর আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।

সকলের অনুরোধে আর সকলের সমঝানোর ফলে শেষ পর্যন্ত শান্ত হলেন কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেব। শান্ত কণ্ঠে বললেন– জি দোস্ত, বলো। তুমি কি জানতে চাও, বলো?

চৌধুরী সাহেব বললেন– আচ্ছা দোস্ত, তোমার ছেলে এতবড় একজন বিদ্যান্ মানুষ, সে কেন এখানে এসে ড্রাইভারী করার মতো খাটুনী করে খাচ্ছে। তার বিদ্যার কথা প্রকাশ করলে তো তার সোনার থালায় ভাত হয়। পরম সুখে দিন কাটাতে পারতো সে। সে কেন চেপে গেলো সে কথা? তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে কেন বললো, সে লেখাপড়া জানে না?

জবাবে ফৌজদার সাহেব ক্লীষ্টকণ্ঠে বললেন– তাই তো বলবে দোস্ত! দোষটা যে আসলেই আমার!

চৌধুরী সাহেব বললেন– সেকি! এ দোষও তোমার?

ঃ জি দোস্ত। আমার দিব্যি দেয়া ছিলো যে, আমি বলেছিলাম– "আমাদের কথা যখন কিছুতেই রাখলে না, তখন আমাদের পয়সার বিদ্যা বেচে খাবে তো হারাম খাবে"।

ঃ কি তাজ্জব! এই কথাই তুমি বলেছিলে?

ঃ জি হ্যাঁ দোস্ত। আমার ধারণা ছিলো, সে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার এ দিব্যি মানবে না। কিন্তু এখন তো দেখছি–

ঃ দেখবেই তো। তোমার ছেলেকে তুমি চেনোনা দোস্ত? তার মতো ঈমানদার আর পরহেজগার ছেলে পিতামাতার দিব্যির কি কোনো অমর্যাদা করতে পারে?

ঃ শুনে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠছে দোস্ত! তা আর কি জানতে চাও, বলো?

ঃ জি দোস্ত, আর একটা কথা জানতে চাই। একটা বিষয়ে বেজায় খট্‌কা লাগছে আমার।

ঃ জি বলো?

ঃ আচ্ছা, তোমার ছেলে রইলো বিলেতে। দেশের ফিরেই সে কি করে জানলো, যে মেয়ের সাথে তুমি তাকে শাদি দিতে চাও, সে মেয়ে একটা নষ্টচরিত্রের মেয়ে?

ঃ তা মানে– মানে হচ্ছে–

জবাবটা হাত্‌ড়াতে লাগলেন ফৌজদার সাহেব। ঘটনাচক্রে মিঃ প্রিন্স্ ও আলেয়া বেগমের প্রিয় হুকুমবরদার হাতেম আলী সেখানে উপস্থিত ছিলো। নড়ে নড়ে উঠে সে বললো– গোস্তাকী মাফ হয় স্যার। সে ঘটনা আমি জানি।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– তুমি জানো?

হাতেম আলী বললো– জি স্যার, আমি সব জানি।

ঃ কি জানো?

ঃ সে মেয়ের নাম মর্জিনা বেগম মিল্কী। বিলাতে থাকতেই আমার এই ভাইজান জেনেছিলেন, মিল্কী একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়ে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে ছিলেন, ঐ মিল্কী একাধিক পুরুষের সাথে লীভ্-টুগেদার করা মেয়ে।

ঃ কি রকম– কি রকম?

ঃ দেশে এসে পরে আরো কিছু লোকের কাছে জানলেও, বিলাতে থাকতেই তিনি জেনেছিলেন, ঐ মিল্কী দুই দুইজন লোকের সাথে লীভটুগেদার করা মেয়ে।

ঃ আরে সেটাই তো জানতে চাচ্ছি। কি করে সে জানলো সেটা।

ঃ স্যার এই ভাইজান যখন অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে শিক্ষকতা করছিলেন, তখন লুৎফর রহমান আর ফজল তালুকদার নামের ভাইজানের দুই কলেজ ফ্রেণ্ড বিলাতে পড়তে যায়। এদের দুইজনের সাথেই মিল্কী বিবি লীভ্‌টুগেদার করেছে– সে কথা এরা দুইজনই ভাইজানকে জানিয়েছিলো।

ঃ আরে জট্ পাকাচ্ছো কেন শুধু? খুলে বলো সব কথা।

ঃ মিল্কী বিবির ছবি আর চিঠি নিয়ে লুৎফর রহমান আগে ভাইজানের কাছে আসে। এসে চিঠি আর ছবি দেখিয়ে সে ভাইজনাকে বলে, "এই মিল্কীর সাথে আমার শাদি দোস্ত্। তাই তোমাকে আমি আগাম দাওয়াত দিতে এলেম। তোমার তো দেশে ফিরতে দেরী আছে। মিল্কীর তাকিদে আমি ডিগ্রী কম্প্লীট্ না করেই দেশে ফিরে যাচ্ছি। তুমি দেশে যখন ফিরবে তখন আমার দাওয়াত রক্ষা করতে অবশ্যই আমার বাড়িতে যাবে কিন্তু একবার। গিয়ে দেখে আসবে আমাদের দাম্পত্য জীবনটা কেমন চলছে।" ভাইজান তাকে বলেছিলেন, "তোমাদের কি আগে থেকেই প্রেম-মুহব্বত ছিলো? লুৎফর রহমান মহোল্লাসে বলেছিলো, "ছিলো মানে কি? গভীর মুহব্বত ছিলো। একি যেমন তেমন মুহব্বত? দীর্ঘদিনের লীভ্টুগেদার করা মুহব্বত আমাদের।" এছাড়া লুৎফর রহমান আরো বলেছিলো, "পত্রে মিল্কী তাকিদ দিয়ে বলেছে, তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে তাকে শাদি না করলে, মিল্কীর বাপ মিল্কীকে অন্য জায়গায় শাদি দিয়ে ফেলবে।"

শুনে চৌধুরী সাহেব বললেন– বলো কি! তারপর?

হাতেম আলী বললো– তার কয়দিন পরেই ফজল তালুকদার নামের ভাইজানের আর এক কলেজ ফ্রেণ্ড দাওয়াত দিতে এলো ভাইজানকে। লুৎফর রহমানের মতোই মিল্কী বিবির ছবি আর চিঠি দেখিয়ে সেও ঐ একই কথা বললো। অর্থাৎ, দেশে ফিরলে ভাইজানকে তাদের নতুন সংসার দেখতে যাওয়ার অনুরোধ করলো। ভাইজানের ঐ একই প্রশ্নের জবাবে ফজল তালুকদারও ঐ একই কথা বললো। বললো, দীর্ঘদিনের লীভ্-টুগেদার করা প্রেম তাদের। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গিয়ে মিল্কীকে শাদি না করলে, মিল্কীর বাপ মিল্কীকে অন্য জায়গায় শাদি দিয়ে ফেলবে। সেই সাথে ফজল তালুকদার বললো, "মিল্কীর তাকিদে তাই এম.ফিল.টা কমপ্লীট না করেই দেশে ফিরে যাচ্ছি"।

জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– তাজ্জব! দুইজনকেই ঐ একই কথা জানিয়েছিলো মিল্কী?

হাতেম আলী বললো– জি স্যার। তাদের কথায় জানা গেলো, দুইজনের সাথেই এক সাথে প্রেম চালিয়েছে মিল্কী বিবি।

ঃ তাজ্জব– তাজ্জব! বড়ি তাজ্জব কি বাত!

ঃ আরো তাজ্জবের কথা যে, পিতার জরুরি তলবে ভাইজান দেশে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর পিতা তাঁকে শাদি দেয়ার জন্যে সব আনযাম প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন। যে পাত্রীর সাথে তাঁকে শাদি দিতে উদ্যত হয়েছেন তিনি, সে পাত্রী অন্য কেউ নয়, এই মর্জিনা বেগম মিল্কীই সেই পাত্রী।

ঃ কি সর্বনাশ! সেকি– সেকি!

ঃ তাঁর পিতাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

চৌধুরী সাহেব তৎক্ষণাৎ প্রিন্সের পিতা ফৌজদার সাহেবকে প্রশ্ন করলেন– কি রুমমেট, ওর কথাটা কি সত্যি?

ফৌজদার সাহেব নত মস্তকে বললেন– জি, রুমমেন্ট, সত্যি।

ঃ একদম সত্যি?

ঃ জি, একদম সত্যি।

ঃ সাব্বাস! তোমাকে সাবাসী দেই দোস্ত! কত কান্ডই না করেছো তুমি ছেলেকে নিয়ে।

ঃ সে জন্যে আমি যারপর নেই অনুতপ্ত দোস্ত। অধিক বলে আর আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না।

ঃ না, আর তা দিতে চাইনে।

অতঃপর তিনি তাঁর মেয়ের দিকে নজর ফেরালেন। বললেন– এবার আমি আলেয়া বেগম আম্মাজানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি আম্মাজান শুনতে পাচ্ছো আমাকে?

অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলো আলেয়া বেগম আলো। সে বললো– জি আব্বাজান। আমাকে কি কিছু বলছেন?

চৌধুরী সাহেব হাসিমুখে বললেন– জি আম্মাজান, বলছি। মিঃ প্রিন্সকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্যে তুমি যে যারপর নেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে, সে খাহেশটা কি আর তোমার আছে?

ঃ জি না আব্বাজান, কি করে থাকবে?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তার মধ্যে এই একটা মাত্র গুণেরই অভাব আছে মনে করে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এ গুণেও যে তিনি এত অধিকমাত্রায় গুণী, এটা জানার পর আর কি সে খাহেস থাকে কারো! ওটা পুরোপুরিই শুকিয়ে গেছে।

ঃ আম্মাজান!

ঃ এমন জব্দও যে হতে হবে আমাকে, এটা কি কল্পনা করতে পেরেছি চৌধুরী সাহেব খানিকটা নেতিয়ে পড়ে বললেন– তা বটে– তা বটে!

আলেয়া বেগম ফের বললো– এ ছাড়া আমাকে পরোয়া করে চলার আর কি কোনো গরজ আছে মিঃ প্রিন্সের যে, আমি আর তার কথা ভাববো? আমাকে হেফাজত করারও তো আর কোনো প্রয়োজন নেই তার।

ঃ আম্মাজান।

ঃ প্রয়োজনে সে এখানে এসেছিলো। এখানে থাকার প্রয়োজন তার এখন শেষ। সবকিছু এড়ে ছেড়ে এখান থেকে চলে গেলেই তো শেষ হয়ে যাবে সব কিছু। পুরোপুরি যবনিকাপাত হবে এ নাটকের।

বইঘর.কম ও রোকন

জামালউদ্দীন প্রিন্স আর চুপ্ থাকতে পারলো না। এবার সে বললো– জিনা ম্যাডাম। আপনি ভুল করছেন। এতদিন আপনাকে এত পরোয়া করে আর হেফাজত করে চলার পর, এখন কি আর একেবারেই সবকিছু এড়েছেড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব?

আলেয়া বেগম মুখ তুলে বললো– নয়?

জামালউদ্দীন প্রিন্স বললো– না। এ ছাড়াও, চা বাগানের বাংলোতে ভূতের ভয়ে যে কাণ্ড করলেন আপনি সেদিন, সে কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে আমি ফেলে যেতে পারি ম্যাডাম? না আপনাকে আমি দিতে পারি অন্য কাউকে?

আলেয়া বেগম তৃপ্তকণ্ঠে বললো– তাই? এসব কি অন্তর থেকে বলছো?

ঃ জি ম্যাডাম, অন্তর থেকেই বলছি। কোনো মনযোগানে কথা আমি বলি না ম্যাডাম। আপনারও তা অজানা নয়।

ঃ বটে! তবু তো "ম্যাডাম-ম্যাডাম" বুলিটা মুখ থেকে যাচ্ছে না।

ঃ দীর্ঘদিনের অভ্যাস ম্যাডাম। একদিনেই কি তা যায়? আলেয়া বেগম সহাস্যে বললো– ওরে আমার পাগ্‌লা আলেম।

এদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন মিঃ প্রিন্সের আব্বা কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেব ও আলেয়া বেগমের আব্বা জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব। এবার ফৌজদার সাহেব চৌধুরী সাহেবকে প্রশ্ন করলেন– ওরা ও সব কি বলছে দোস্ত্?

চৌধুরী সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন– কি বলছে তা বুঝতে পারছো না?

ঃ না দোস্ত, ঠিক আঁচ করতে পারছিনে।

ঃ ওরে অবোধ দোস্ত, ওরা বলছে মন দেয়া-নেয়ার কথা। মুহব্বতের কথা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে ফৌজদার সাহেব বললেন– সোবহান আল্লাহ! তাই নাকি দোস্ত, তাই নাকি?

চৌধুরী সাহেব বললেন– আর তাই নাকি! ছেলের মেয়ে পছন্দ না হওয়ায়, তুমি ছেলের শাদি দিতে পারো নি দোস্ত। সে জন্যে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে দীলে তোমার। এবার ছেলেই পছন্দ করেছে মেয়ে, মানে পাত্রী। কাজেই আর দেরী কেন দোস্ত্? ছেলের শাদি দিয়ে এবার তোমার সেই দীলের ক্ষোভ দূর করো।

ঃ এ্যাঁ! তাই নাকি– তাই নাকি? তা কে ঐ মেয়ে দোস্ত? ঐ যে ঐ বেহেস্তের হুরীর মতো সুন্দরী আম্মাজান কে? পরিচয় কি ওর?

ঃ ওর পরিচয় জানতে চাও? ও হলো তোমারই এই দোস্ত জহির উদ্দীন চৌধুরীর মেয়ে।

www.boighar.com

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে কামালউদ্দীন ফৌজদার সাহেব বললেন– এ্যাঁ। কি বললে– কি বললে? জহির উদ্দীন চৌধুরী মানে? ঐ আম্মাজান তোমার মেয়ে?

ঃ জি। ওটা আমারই মেয়ে দোস্ত্।

আনন্দে ফৌজদার সাহেব আওয়ারা বনে গেলেন। চৌধুরী সাহেবকে সবলে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন– মারহাবা মারহাবা। ওঃ! কেয়া খোশ-কেয়া খোশ্! তোমার মেয়ে? আনযাম করো দোস্ত্। দয়া করে এখনই ওদের শাদির আনযাম করো।

ঃ আনযাম করবো?

ঃ জি–জি। এর আনন্দের সাথে আর এক আনন্দ। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে পাওয়ার সাথে এমন সুন্দরী বৌমা পাওয়া। মানে, ডবল আনন্দ–ডবল আনন্দ! একদিনের বিলম্বও আর আমার সামাল দেয়ার সাধ্য নেই দোস্ত্। আজই ওদের শাদি মোবারক সুসম্পন্ন করে দাও।

www.boighar.com

ঃ এ্যাঁ! আজই?

ঃ আজই দোস্ত, আজই। আমার একান্ত অনুরোধ

হাত জোড় করলেন ফৌজদার সাহেব। চৌধুরী সাহেব বললেন– আরে–আরে, তা কি করে হয়। ছেলের আম্মা দেশে পড়ে রইলেন। তাঁর অমতে আর অজান্তে ছেলের শাদি দিলে তিনি তো মস্ত বড় চোট পাবেন দীলে।

ঃ মোটেই না, মোটেই না। পুত্রের সাথে এমন সুন্দরী পুত্রবধু পেলে, দীলে চোট পাওয়া তো দূরের কথা, আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে যাবেন। দিউয়ানা বনে যাবেন।

ঃ বলছেন?

ঃ বলছি মানে কি? হলফ করে বলছি।

ঃ আলহাম্দুল্লিাহ্! শুকুর আলহাম্দুলিল্লাহ্।

০০০ ০০০ ০০০

শুরু হলো শাদির আনযাম। একমাত্র মেয়ের শাদি। তাঁর রুমমেট্ কামাল উদ্দীন ফৌজদার সাহেব অনুরোধ করলেও জহির উদ্দীন চৌধুরী সাহেব একেবারেই অনাড়ম্বরভাবে, মানে বিনা ধুমধামে তৎক্ষণাৎ শাদি দিতে পারেন না মেয়ের। অনেক তাঁর আত্মীয়-স্বজন, অনেক তাঁর শুভাকাংক্ষী। তাদের হাত এড়াতে না পেরে জোর ধুম ধাম শুরু করলেন চৌধুরী সাহেব। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ফৌজদার সাহেবও মেনে নিলেন সেটা।

আলেয়া বেগম আলোকে একান্তে পেয়ে মিঃ প্রিন্সের ছাত্র আবু তালেব বিস্মিত কণ্ঠে বললো– কি তাজ্জব আপা! এয়্সান-এয়্সান কারবার!

আলেয়া বেগম বললো– এয়্সান–এয়্সান কারবার মানে?

ঃ মানে, না জেনে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির অধ্যাপককে গাড়ির ড্রাইভার বানিয়ে রেখেছিলেন, তা নিয়ে আর তাজ্জব হচ্ছিনে। আপনি জেনেছিলেন, মিঃ প্রিন্স্ একেবারেই এক অশিক্ষিত মানুষ একটা সুন্দর মাকাল ফল। আমি তাজ্জব

হচ্ছি এই ভেবে যে, ঐ অশিক্ষিত মাকাল ফলের রূপ দেখেই আপনি মজে গিয়েছিলেন আপা?

ঃ মজে গিয়েছিলাম কি রকম?

ঃ রকম মানে, আগে থেকেই মজে আছেন আর এখন ঐ ডাইভারকেই আমার দুলাভাই বানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। মনপ্রাণ সঁপে দিতে যাচ্ছেন তাঁর হাতে।

আলেয়া বেগম কপট রোষে বললেন– তবেরে! বেয়াদব বেশরম কাঁহাকার! বড় এঁচুড়ে পাকা হয়ে গেছো, না?

ঃ তা আমাকে গালাগাল করে লাভ কি আপা। একগাদা লোকের সামনে ওভাবে মন দেয়া নেয়া করেও আপনি রেশরম হলেন না, আর বেশরম হলেম আমি?

ঃ আবু তালেব।

ঃ শুধু ঐ টুকুইতো নয়, চা বাগানের বাংলোতে ভূতের ভয়ে আপনি যে আরো অনেক কাণ্ডই ঘটিয়ে ছিলেন, তাও সবাই জেনে গেলো। এরপরও দোষ দিচ্ছেন আমাকে?

ঃ ইশ্‌রে!

ঃ তা যতই রাগ করেন আপা, আপনার চয়েস্ আছে বলতে হবে। আচ্ছা মানুষকেই বাগিয়েছেন আপনি।

www.boighar.com

ঃ আবু তালেব!

ঃ আপনার নসীব বড়ই উম্‌দা নসীব আপা। রূপে গুণে আমার স্যারের মতো এমন এক দুর্লভ মানুষকে তাগড়া নসীবের জোরেই পেয়ে যাচ্ছেন আপনি।

ঃ ফের?

ঃ সম্পর্ক এখন কিন্তু বদলে যাচ্ছে আমাদের আপা। আপনি কিন্তু আমার ম্যাডাম হচ্ছেন অতঃপর।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ যিনি আমার ডাইরেক্‌ট্ শিক্ষক আপনি তার বউ হতে যাচ্ছেন। স্যারের বউকে সবাই ম্যাডামই বলে।

ঃ তবে রে–

কপটরোষে তেড়ে এলো আলেয়া বেগম। হাসতে হাসতে দৌড় দিলো আবু তালেব।

আলেয়া বেগম ও মিঃ প্রিন্স্ একপাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলো। দেখতে পেয়ে তাদের কাছে ছুটে এলো হাতেম আলী। তাদের কাছে এসে কেঁদেই ফেললো সে। বললো– আপনারা তো এখান থেকেই চলেই যাচ্ছেন ভাইজান।

আপনার আব্বা আপনাকে আর ম্যাডামকে নিয়ে তাঁর দেশে চলে যাচ্ছেন। এখন আমার কি দশা হবে?

মি: প্রিন্স বললো– তোমার দশা মানে?

ঃ মানে, আমি এখন কোথায় থাকবো আর কার কাছে থাকবো?

ঃ আরে সেকি! তুমি আমাদের কাছে থাকবে।

ঃ আপনাদের কাছে!

ঃ হ্যাঁ। আমাদের সাথে আমাদের দেশে যাবে আর আমাদের কাছে থাকবে।

হাতেম আলী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আর আবেগ ভরে বললো– বলেন কি ভাইজান, তাই? ওঃ! কি আনন্দ– কি আনন্দ!

এবার আলেয়া বেগম বললো– তাছাড়া তোমার কাছে আমি ওয়াদাবদ্ধ আছি, না? তুমি আমাদের সাথে না গেলে আর না থাকলে, আমি আমার ওয়াদা পালন করবো কিভাবে?

হাতেম আলী বললো– ওয়াদা। কোন্ ওয়াদা ম্যাডাম?

আলেয়া বেগম বললো– ঐ যে, তোমার মনে নেই? ঐযে সেবার কেতাব পাঠ করার কথায় আমি বলেছিলাম– "শোনার কেউ না থাকলে, একা একা কেতাব পাঠ করার ধৈর্য তোমার কতক্ষণ থাকবে?" তুমি আফছোস্ করে বলেছিলে, "দোকা কেউ না থাকলে একা একা পাঠ করা ছাড়া আর উপায় কি?" তোমার আফছোস দেখে আমি বলেছিলাম, "দোকার অভাবটা তোমার মনে খুব বিঁধ্ছে বুঝি? ঠিক আছে– ঠিক আছে, তোমার দোকা হওয়ার সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো"। মনে নেই সে কথা?

www.boighar.com

হাতেম আলী সলজ্জকণ্ঠে বললো– জি ম্যাডাম, জি। আছে, তা আছে।

ঃ আমাদের সাথে চলো। ওখানে গিয়ে আমাদের সাথে থাকবে আর তোমার দোকার ব্যবস্থাও করে দেবো ওখানে গিয়ে।

www.boighar.com

ঃ জি?

ঃ আমার সেই ওয়াদা ওখানে গিয়ে পূরণ করবো আমি। এর এক বিন্দুও ব্যতিক্রম ঘটবেনা।

www.boighar.com

ঃ ম্যাডাম!

ঃ তোমার ম্যাডাম তার ওয়াদার কখনো বরখেলাপ করে না। দোসর সাথে নিয়ে নিয়ে আমাদের সাথে পরম সুখে থাকবে তুমি, চলো–

পরম উল্লাসে হাতেম আলী বলে উঠলো– আলহাম্দুলিল্লাহ– শুকুর আলহাম্দুলিল্লাহ – শুকুর আলহাম্দুলিল্লাহ!

সমাপ্ত